কাজী মুহাম্মাদ ইবরাহীম

তাওহীদ জিজ্ঞাসা জবাব ১

তাওহীদ জিজ্ঞাসা জবাব
(১)

কাজী মুহাম্মাদ ইবরাহীম
প্রধান মুহাদ্দিস, জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী
খতিব, বায়তুল আমান জামে মসজিদ, মতিঝিল সরকারি কলোনি
(আল-হেলাল জোন) ঢাকা-১০০০

তাওহীদ জিজ্ঞাসা জবাব

প্রকাশক
জিয়াউল আলম (মাসুদ)
সালেহ আহমেদ রতন

প্রকাশকাল:
তৃতীয় প্রকাশ : [সংশোধিত ও সংবর্ধিত]
রমজান- ১৪৩২ হিজরী
শ্রাবণ- ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
আগষ্ট- ২০১১ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ
মাল্টি লিংক
৬৮, ফকিরাপুল (ইসলাম ভবন), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৭১৯১৮১৮, e-mail : multilinkp@gmail.com

মূল্য : ১২০.০০ টাকা
ISBN: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৩৮৫৫-৬

মানারাহ্ পাবলিকেশন
বাড়ী নং : ১৯২/এ (৪র্থ তলা)
সড়ক : ১, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬
ফোন : ৮৭১১১৩১-২, ৮৮৬১৩৮১, ৮৮৬১৯৪৬,
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৭১১১২৯

হে নবী!
আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী
রূপে প্রেরণ করেছি এবং
আল্লাহর আদেশক্রমে
তাঁর দিকে আহ্বায়ক রূপে
ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

সূরা আল আহ্‌যাব- ৪৫ ঃ ৪৬

মানারাহ্ পাবলিকেশন

সূচি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

দ্বিতীয় পর্ব (২০টি)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

তৃতীয় পর্ব (২০টি)

তাওহীদদীপ্ত আক্বিদা বিশ্বাসই হল
ঐ মহাশক্তি
যা নিউকিয়ার পাওয়ারের চেয়েও
ক্ষমতায় অনেক অনেক গুণ
শক্তিশালী।
এ বিশ্বাসই পারে বিশ্ব বিপ্লব ঘটাতে।
এ বিশ্বাস শক্তি দিয়েই
নির্মূল করা সম্ভব
সকল তাগুতী শক্তি।

ভূমিকা

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله–أما بعد.

এ বইটি মূলত একটি প্রতিযোগিতামূলক রচনা। যা সৌদি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ সিলেট বাংলাদেশের পক্ষ হতে আয়োজিত-

"তাওহীদ বিষয়ক জ্ঞান প্রতিযোগিতা-'৯৯"

এর উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। প্রায় আড়াই হাজার আলেম-ওলামা, ডক্টর, প্রফেসর, ছাত্র-ছাত্রী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে এ রচনাটি প্রথম পুরস্কারে ভূষিত হয়। পুরস্কারটি ছিল তাওহীদের প্রাণকেন্দ্র বাইতুল্লাহর ওমরা হজ্জের টিকেট। পুরস্কার ছিল সর্বমোট ১০০টি। প্রথম সারির ৩টি সহ মোট ৫টি পুরস্কার জামেয়া কাসেমিয়ার আঙিনায় এসেছিলো। রচনার বিষয়বস্তুটি ইসলামের শাশ্বত প্রাণ সত্তা তথা তাওহীদ ও তার প্রাসঙ্গিক জরুরি বিষয়াবলী হওয়ায় কিছু পরিবর্ধনসহ এটিকে বই আকারে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

শিরকমুক্ত তাওহীদদীপ্ত সুন্নাহর কাঠামোয় সম্পাদিত আক্বিদা-বিশ্বাস, কথা ও কর্মই আল্লাহর কাছে ইবাদতরূপে স্বীকৃত। ইবাদতের ভেতরের অবকাঠামো হবে তাওহীদের, বাইরের কাঠামো হবে সুন্নাহর। অন্তরে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবেন আল্লাহ। সে লক্ষ্যের দিকে চলতে হবে ঐ পথ ধরেই যে পথ নিয়ে এসেছেন মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে পথ নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন জীবরাইল আমিন। যে পথ নাযিল করেছেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন। এ লক্ষ্য স্থির করে এ পথ চলার মধ্যেই রয়েছে ইহ-পরকালের মুক্তি ও শান্তি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে এসে দেখলেন কোটি কোটি মানুষ মাটি ও পাথর নির্মিত মূর্তির পূজা করছে। কোটি কোটি মানুষ পূজা করছে যীশু ও মেরীর। অসংখ্য মানুষ পূজা করছে জ্বিন, ফেরেশতা ও অলি আউলিয়ার। তিনি দেখলেন চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র থেকে শুরু করে বৃক্ষলতা

পর্যন্ত পূজিত হচ্ছে ভক্তি শ্রদ্ধাভরে। প্রকৃত মা'বুদের ইবাদত-দাসত্ব ভুলে গিয়ে মানুষ পূজা করছে বাতিল সব মা'বুদ ও দেবতার। শত শত বছরের শিরকের বহুরূপী জমাট অন্ধকার থেকে মানব জাতিকে উদ্ধার করতে হেরার গুহা থেকে তিনি নেমে এলেন তাওহীদের প্রানোজ্জ্বল করা আলো ও নূর নিয়ে।

তাঁর নবুয়্যতের প্রথম এগারটি বছর কেটে গিয়েছিল শুধুই এসব অন্ধকার দূর করার মিশনে। তাওহীদ যতদিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি ততদিন পর্যন্ত নাযিল করা হয়নি সালাতের ফরজ বিধান। ততদিন পর্যন্ত ফরজ করা হয়নি যাকাত, হজ্জ ও সিয়াম। কেননা তাওহীদ ব্যতীত এসব ইবাদতের কোনই মূল্য নেই।

তাওহীদদীপ্ত আক্বিদা বিশ্বাসই হল ঐ মহাশক্তি যা নিউক্লিয়ার পাওয়ারের চেয়েও ক্ষমতায় অনেক অনেক গুণ শক্তিশালী। এ বিশ্বাসই পারে বিশ্ব বিপ্লব ঘটাতে। এ বিশ্বাসশক্তি দিয়েই নির্মূল করা সম্ভব সকল তাগুতী শক্তি।

আজ বাংলাদেশে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে একটি প্রাণবন্ত তাওহিদী মহাবিপ্লব। তাগুত ও মূর্তি-পূজার বিচিত্র সব অন্ধকার ঘিরে ধরেছে বাংলাদেশকে। কালী পূজার অন্ধকার, প্রতিকৃতি পূজার অন্ধকার, অগ্নিশিখা, মঙ্গল প্রদীপ, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ ইত্যাদি পূজার অন্ধকার, কবর-মাজার পূজার অন্ধকার, গাউস, কুতুব, পীর পূজার অন্ধকার, খাজা বাবা, দয়াল বাবা, মাইজভাণ্ডারী বাবা পূজার অন্ধকার, চট ও জটধারী ফকির, উলংগ ফকির পূজার অন্ধকার, কুফরী তন্ত্র-মন্ত্র, কুফরী মতবাদ পূজার অন্ধকার সহ এ সকল অন্ধকার বা জুলুমাতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে গোটা বাংলাদেশ।

পবিত্র কুরআনে এ জন্যই শিরকের অন্ধকারকে বলা হয়েছে জুলুমাত তথা বহু বিচিত্ররূপী অন্ধকার। আর তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে একবচন শব্দ তথা নূর দিয়ে। আল্লাহ যেমন এক, তাঁর তাওহীদের নূরও এক। আল্লাহর তাওহীদের এ একক নূর দিয়েই দূরীভূত করতে হবে বিচিত্র সব শিরকের অন্ধকার বা জুলুমাত।

শিরকের অন্ধকার থেকে তাওহীদের নূরের দিকে বাংলাদেশের মানুষদেরকে বের করে আনার জন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমরা সেদিনের প্রতীক্ষায় রয়েছি যেদিন তাওহীদের উজ্জ্বল আলো এদেশ থেকে বিদূরিত করবে শিরকের নিকষ কালো আঁধার সমূহ।

আমরা আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি সুন্দর তাওফীক দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। অতঃপর সে সব ঈমানী ভাইদের শুকরিয়া প্রকাশ করছি যাদের ব্যবস্থাপনায় তাওহীদের এ আলো অনেক বিস্তৃত ও সাবলীল রূপ নিয়ে আমাদের দোরগোড়ায় বিচ্ছুরিত হয়েছে। আমরা তাদেরও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যারা শৈল্পিক মেধা ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে বইটি প্রকাশের পথ সুগম করেছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমাদের আরজ, বইটিতে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে 'মুমিন মুমিনের আয়না' হিসেবে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

কাজী মুহাম্মাদ ইবরাহীম

তাওহীদ

প্রথম সোপান

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই এক স্রষ্টার সৃষ্টি এবং এক শিল্পীর শিল্পকর্ম। মানুষ সেই মহান স্রষ্টা ও শিল্পীর অজস্র সৃষ্টির মাঝে একটি সৃষ্টি মাত্র। সমগ্র সৃষ্টিলোকের সব কিছুই সেই মহান স্রষ্টা ও শিল্পীর সম্মুখে একত্ববাদী চিত্তে সেজদাবনত হয়ে যায়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষায় গুণগানসহ তাঁরই তাসবীহ জপতে থাকে। মানুষ ও জ্বিন জাতির বিভ্রান্ত অংশটি ব্যতীত সৃষ্টিলোকে কোথাও তাওহীদ ও একত্ববাদ ছাড়া শিরক, পৌত্তলিকতা ও অংশীবাদের কোনই অস্তিত্ব নেই। সর্বত্রই চলছে এক সত্য মা'বুদের ইবাদাত, দাসত্ব ও আনুগত্য।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِ الرَّحْمَـٰنِ عَبْداً – (سورة مريم-٩٣)

অর্থাৎ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে, দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না বান্দাহরূপে।" (সূরা মারইয়াম-৯৩)

জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষই একত্ববাদী। প্রত্যেকেই তার হৃদয়ের গভীরে মহান স্রষ্টার পরিচয় ও ভালবাসা বহন করে। একজন তাওহীদবাদী শিল্পী বলেন-

"আল্লাহ আমার রব,
এই রবই আমার সব
দমে দমে তনু মনে
তাঁরই অনুভব"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

"ما من مولود إلا يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرا نه أو يمجسانه
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثـم يقول
"فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالك الدين القيم"
(بخارى، مسلم)

অর্থাৎ-"প্রতিটি শিশুই আল্লাহর পরিচয়, একত্ববাদ ও ভালবাসার উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বানায় অথবা খৃস্টান বানায় অথবা অগ্নিপূজারী বানায়। যেমনিভাবে একটি পশু একটি পরিপূর্ণ বাচ্চা প্রসব করে (যার মধ্যে কোন দোষ ও অপূর্ণতা থাকে না।) তোমরা কি সেগুলোর মধ্যে কোন কান কাটা নবজাত বাচ্চা দেখেছ ? অতঃপর রাসূল (সাঃ) কুরআনের এ আয়াত আবৃত্তি করলেন-

"فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالك الدين القيم"

অর্থাৎ "এটাই (একত্ববাদী দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা) আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন।"

প্রকৃত অর্থে একটি শিশু শাবক নিখুঁত ও পরিপূর্ণ দুটো কানসহ সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু মানুষ কান কেটে তাকে বিশ্রী ও ক্রুটিযুক্ত করে ফেলে। এভাবে একটি মানব শিশু আল্লাহর পরিচয়, ভালবাসা ও একত্ববাদী চেতনা নিয়ে জন্মলাভ করার পর পিতা-মাতা কর্তৃক বিভ্রান্ত হয়ে শিরক, অংশীবাদ ও অগ্নিপূজায় লিপ্ত হয় এবং কান কাটা পশু শাবকের মতই অসুন্দর, বিকৃত ও ক্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে সে হারিয়ে ফেলে মহান স্রষ্টার প্রকৃত পরিচয়। স্বভাবগতভাবে প্রতিটি মানুষ একত্ববাদী চেতনাসহ আল্লাহর ইবাদাত করার মনোবৃত্তি নিয়েই দুনিয়ায় আগমন করে। ইবাদাত ও দাসত্ব তার প্রকৃতিগত। সে কোন না কোন সত্তার দাসত্ব করবেই। এজন্যেই একমাত্র মা'বুদের পরিচয় হারিয়ে ফেললে শত সহস্র কৃত্রিম, অসত্য মা'বুদের ইবাদাত করে সে তার প্রকৃতিগত দাসত্ব প্রবৃত্তির উপশম করতে প্রয়াস পায়। সে নিজ হাতেই বানিয়ে নেয় নিজের মা'বুদ।

এ পথহারা মানুষকে প্রকৃত সত্য মা'বুদের পথের দিশা দেয়ার জন্যেই যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন নবী ও রাসূলগণ। তাঁরা স্মরণ করিয়ে দেন সেই পরম প্রিয় জনের পরিচয়, যাঁর স্মরণ ব্যতীত মানব হৃদয় কোন কিছুতেই কখনো শান্তি পেতে পারে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ- (سورة رعد-٢٨)

অর্থাৎ "জেনে রাখ, হৃদয়সমূহ প্রশান্ত হয় কেবল আল্লাহর স্মরণে।"

(সূরা রাদ-২৮)

'যিকির' বা স্মরণ শব্দটি তখনই ব্যবহৃত হয়, যখন পূর্ব পরিচিত কোন জিনিস ভুলে যাবার পর পুণরায় হৃদয়ে আলোচিত হয়। যার সাথে আগে পরিচয় ছিল না তার আলোচনাকে কোন ভাষাতেই যিকর বা স্মরণ বলা হয় না। এ জন্যেই আল্লাহ তাঁর আলোচনাকে, কুরআনকে যিকর, তাযকেরাহ, যিকরা তথা স্মরণিকা নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নাম দিয়েছেন মুযাক্কির তথা স্মরণদাতা বা যিনি স্বরণ করিয়ে দেন। পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, সুন্দর উদ্ভিদ জগত এসব কিছুকেও কুরআনে যিকরা বা স্মরণিকা বলা হয়েছে। এ সবই হৃদয়ের কাছে পূর্ব পরিচিত দয়াময় স্রষ্টাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহর সৃষ্ট মহাবিশ্ব এবং বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র কণিকা থেকে শুরু করে সুবিশাল গ্যালাক্সি, পৃথিবী ও মহাকাশ সবই একজন স্রষ্টা ও শিল্পীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য ও সুস্পষ্ট প্রমান বহন করে। কিন্তু সে স্রষ্টা কে ? তাঁর নাম কী ? কি'ইবা তাঁর পরিচয় ? তিনি কি একক সত্তা ? এ সব তো আর আকাশ, মাটি ও সৃষ্টিজগত আমাদেরকে জানাতে পারে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ثم علموا من القر أن ثم علموا من السنة

(مسلم-١/٨٢)

অর্থাৎ-"নিশ্চয়ই আমানত তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর পরিচয়, তাওহীদ ও ভালবাসা মানুষের মর্মমূলে নাযিল হয়েছে। তারপর তারা তা জানতে পেরেছে কুরআন থেকে। অতঃপর জানতে পেরেছে সুন্নাহ থেকে। (মুসলিম-১/৮২)

বস্তুত আল্লাহর সাথে সৃষ্টিগত, স্বভাবগত, হৃদয়গত এ পূর্ব পরিচয়টি না থাকলে কুরআন, সুন্নাহ ও সৃষ্টিকুল কোন কিছু দিয়েই সে মহান শিল্পী রাব্বুল আলামীনের এককসত্তার সুনিপুণ পরিচয় পাওয়া যেত না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহঃ) বলেন-

وهذا شأن الحق الذى يطلب معرفته بالدليل فلابد أن يكون مشعورا به فى النفس حتى يطلب الدليل عليه أو على بعض أحواله و أما ما لا تشعر به النفس أصلاً فليس مطلوبا لها البتة (كتاب التوحيد لابن تيمية)

"যে চিরন্তন সত্যটি মানুষ দলীল প্রমাণ দিয়ে জানতে চায়, তার সম্পর্কে হৃদয়ে পূর্ব অনুভূতি ও পরিচয় থাকার ফলেই সে তাকে অথবা তার কিছু

অবস্থা জানতে দলীল এর অন্বেষণ করে। কিন্তু হৃদয়ে যাকে পূর্ব থেকে অনুভবই করতে পারে না তাকে জানার স্পৃহা কিছুতেই তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না।"

(কিতাব আত-তাওহীদ লি ইবনি তাইমিয়্যাহ)

মহান স্রষ্টা ও শিল্পী আল্লাহর সাথে মানব হৃদয়ের এ গভীর পরিচিতি, মহাকালের অতীত কোন ক্ষণে তাদের থেকে নেয়া তার রুবুবিয়্যাতের (সৃষ্টি ও প্রতিপালনের) সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি, কুরআন, সুন্নাহ ও সৃষ্টিজগতের হৃদয়গ্রাহী অকাট্য দলীল দ্বারা তাঁর পরিচয়, একত্ববাদ ও ভালবাসার স্মৃতিচারণ সবই এক দুর্লঙ্ঘ পরম্পরায় শক্তভাবে গাঁথা। প্রথম পরিচয়টি না থাকলে পরবর্তী পরিচয়গুলো হতো নিষ্ফল। পরবর্তী পরিচয়গুলো প্রথম পরিচয়ের সমর্থন, নবায়ন ও স্মৃতিচারণ মাত্র।

মায়ের কোলে থেকে থেকে শিশু যখন ভালভাবে তাকে চিনে নেয় তখন আড়ালে থেকে মা তার শিশুকে ডাকলে পূর্ব পরিচয়ের ফলেই অনায়াসে শিশু বুঝে নেয় এ যে আমার মা। পূর্ব পরিচয়টা না থাকলে শিশুটি কিছুতেই বুঝতনা যে এ আওয়াজ তার মায়ের। প্রতিটি মানবের হৃদয়মূলে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অতীত এমনই এক পরিচয়, প্রীতি ও একত্বের তুলনাহীন সম্পর্ক রয়েছে তার দয়াময় স্রষ্টার সাথে। প্রকৃতিগতভাবে হৃদয় আর কাউকে ভালবাসে না।

কম্পাসের কাঁটার মতই সে সর্বদা একমুখী। সুরা রা'দের ২৮ তম আয়াতের অলৌকিক শব্দ বিন্যাস দ্বারা বুঝা যায় মানবাত্মাকে আল্লাহ ব্যতীত আর যে দিকেই নেয়া হোক না কেন সে সেখানে থেকে দিক পরিবর্তন করবেই। আয়াতটির শব্দ বিন্যাস নিম্নরূপ ঃ-

ذكر الله 'আল্লাহর স্মরণ।' تطمئن 'স্থির হয়ে যায়।' القلوب 'সদা বিচরণশীল, পার্শ্ব পরিবর্তনকারী অন্তর। অর্থাৎ- মানবাত্মা আল্লাহর প্রণয় প্রীতি ও স্মরণ না পেলে অস্থিরতা হেতু পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকে। আর যখনই প্রণয় প্রীতিহেতু স্মরণ রূপ শারবান তহুরা পেয়ে যায় তখনই সে অস্থিরতা ও দিক পরিবর্তন ত্যাগ করে মুতমাইন ও সুস্থির হয়ে যায়।

শিশুকালে পৃথিবীর পরিবেশজনিত কারণে অন্তর বাঁধা থাকে মায়ের সাথে, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম পর্বে বাঁধা থাকে খেলার সঙ্গীদের সাথে, পরিণত বয়সে বাঁধা থাকে জীবন সঙ্গীর সাথে, পৌঢ় কালে বাঁধা থাকে সন্তান-সন্ততির সাথে, বৃদ্ধ বয়সে বাঁধা থাকে নাতি-নাতনীর সাথে। একের পর এক এভাবেই এক সময়ের প্রীতিভাজনকে ত্যাগ করে আরেক

প্রীতিভাজনের দিকে দিক পরিবর্তন করতে থাকে। তারপর আসে জীবনের অন্তিম সায়াহ্ন একাকী শয্যায় পড়ে থাকার পর্ব। যেখানে কবির ভাষায়-

নয়ন ভরিয়া আছে আঁখিজল মুছাবার কেহ নাই,
হৃদয় ভরিয়া কথার কাকলি শোনাবার কেহ নাই।

তারপর এ অসহায়ত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে পৃথিবীর সব প্রিয়জনকে চিরদিনের জন্য চির বিদায় দেয়ার মাধ্যমে। তখন কেউই আর জীবনের সঙ্গী হয়ে সাথে যায় না। অতএব মানবাত্মাকে তার পরমাত্মীয় চিরস্থায়ী বন্ধু মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে বেঁধে দেয়াই হচ্ছে অসহায়ত্ব, একাকীত্ব, চির সঙ্গীহীনতা ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার উপায়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে :

فَا طِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِى فِيْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ- "হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, আপনিই আমার পরম বন্ধু ইহ-পরকালের।"

'আল্লাহ' নামক মহাপরাক্রমশালী কালেমাটির ভেতরেই লুকিয়ে আছে বান্দাদের পরম প্রীতি ও প্রীতির প্রাবল্য বিগলিত বশংবদ ও গোলাম হয়ে যাওয়ার মর্মকথা। কেননা আল্লাহ মানে সত্য মা'বুদ আর মা'বুদ মানে ঐ সত্তা যার ইবাদাত করা হয়। আর ইবাদাত মানে غاية الذل بغاية الحب অর্থাৎ - ভালবাসা ও বিনয়ের চূড়ান্ত পর্যায়। যেখানে পৌঁছে বান্দা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য প্রতিযোগী, তাঁর করুণা প্রত্যাশী ও তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে যায়।

আল্লহ বলেন-

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوْ الْأَلْبَابِ

– (سورة الزمر–٩)

অর্থাৎ-"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদাত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমতের প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে এরূপ করে না, বলুন যারা জানে আর জানে না তারা কি সমান হতে পারে ? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে যারা বুদ্ধিমান।"

(সূরা যুমার- ৯)

আল্লাহর প্রতি ভালবাসা তাঁর শাস্তির ভয়, তাঁর রহমতের আশা বান্দাকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে বাধ্য করে। আল্লাহ্ বলেন-

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ – (سورة المومنون–٦٠)

অর্থাৎ- "এবং যারা যা দান করবার তা ভীত কম্পিত হৃদয়ে এ জন্যে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।"

(সূরা আল মুমিনুন-৬০)

একটি মানব হৃদয় প্রীতি ও ভালবাসার যে প্রান্তসীমায় পৌঁছতে পারে সেই প্রান্তসীমায় পৌঁছে প্রীতি হেতু ততটা বিনয় অবনত, বিগলিত হয়ে যাওয়া যতটা বিনয়ী ও বিগলিত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব। এ চূড়ান্ত প্রণয় বিগলিত বান্দাকেই বলা হয় 'আব্দুল্লাহ্'বা আল্লাহর বান্দাহ।

ইবাদাতরূপ পরম প্রণয় ও বিনয়ের লক্ষ্যেই জ্বিন ও মানবের সৃষ্টি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ (سورة الذاريات–٥٦)

অর্থাৎ- "আমি তো জিন ও মানব জাতিকে আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

(সূরা যারিয়াত-৫৬)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন-

ليس العبادة غير توحيد المحبة * مع خضوع القلب والاركان

والحب نفس وفاقه فيما يحب * وبغض ما لا يرتضي بجنان

ووفاقه نفس اتباعك أمره * والقصد وجه الله ذي الإحسان

(مجموعة التوحيد ٢٩)

"হৃদয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে প্রীতি ও ভালবাসার একত্ববাদকেই ইবাদাত বলে। আল্লাহ যা ভালবাসেন তার সাথে পূর্ণ একাত্মতা এবং যা অপছন্দ করেন তার সাথে হৃদয় প্রাণ দিয়ে ঘৃণা পোষণ করাকেই ভালবাসা বলে। অবদানের অধিপতি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁর আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করাকে একত্মতা বলা হয়।"

যে তাওহীদ নিয়ে রাসূলগণ এসেছিলেন তা ছিল ইবাদাতের তাওহীদ তথা পরম প্রণয় প্রীতি, চরম আকৃতি-মিনতি ও বিনয়ের তাওহীদ। এটাই হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তাওহীদ। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ ,মাহবুব, মাকছুদ নেই। এ হল এ তাওহীদের মর্মকথা।

ইবাদাতের বাইরের কাঠামো মুহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ রূপ খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী করে ভেতরের কাঠামো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তাওহীদ রূপ পরশমনি দিয়ে বানিয়ে অন্তরে- বাইরে আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে যাওয়াই হল মানব জীবনের মূল লক্ষ্য।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

صِبْغَةَ اللهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ۚ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُوْنَ – (سورة البقرة–١٣٨)

অর্থাৎ- "আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। রঙে আল্লাহর চাইতে কে অধিকতর সুন্দর ? আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।"

সুরা বাকারা-১৩৮

তিনি আরো বলেন-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ –
(سورة الحديد–٢٥)

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।"

(সূরা আল হাদীদ- ২৫)

প্রকৃতপক্ষে তাওহীদই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সুবিচার আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় অবিচার। কেননা সকল ইবাদাত কেবল আল্লাহরই অধিকারভুক্ত। তিনিই এর সার্বভৌম ও নিরঙ্কুশ মালিক। ইবাদাত তাঁরই নির্ভেজাল হক, আর তাঁর হক তাঁকে দেয়াই তো সুবিচার।

দ্বিতীয় সোপান

তাওহীদ ও একত্ববাদের সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে- শিরক বা অংশীবাদ। শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম। জুলুম মানে হল কোন জিনিস অপাত্রে স্থাপন করা, একের জিনিস অন্যকে দেয়া। অতএব শিরক নামক জুলুমের মানে হল, আল্লাহর জিনিস আল্লাহকে না দিয়ে অন্যকে দেয়া। শিরককারীরা এ জুলুমটি তিন ভাবে করে থাকে।

(ক) আল্লাহর কোন সিফাত বা গুণ সৃষ্টির উপর প্রয়োগ করা। যেমন ঃ ইলমুল গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান কোন সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করা। আল্লাহর এ গুণ দ্বারা সৃষ্টিকে বিশেষিত করা।

(খ) আল্লাহর কোন ফে'ল বা কাজ সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করা। যে কাজ আল্লাহ করেন সে কাজটি অন্য কেউ করছে বলে উক্তি করা। যেমন ঃ রোগ নিরাময়। এটি আল্লাহর কাজ। কেউ যদি বলেন ডাক্তার নিরাময় করেছেন তাহলে সে আল্লাহর কাজটি ডাক্তারের সাথে সম্পৃক্ত করল।

(গ) আল্লাহর জন্য করণীয় কোন ইবাদাত সৃষ্টির জন্য করা। যেমন ঃ সেজদা, এটি আল্লাহর পাওনা। এটি অন্য কাউকে দিলে আল্লাহর পাওনা অপরকে দিয়ে দেয়া হল। এভাবে আল্লাহর পাওনা ও হকগুলো যেগুলো ধারণ করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো নেই অন্যকে দেয়া সবচেয়ে বড় জুলুম। যে এমনটি করে তার থেকে বড় জালিম আর কেউ নেই। এ জুলুমের পেছনে কতগুলো কারণ নিহিত রয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এ জুলুমের ভয়াবহতা ও তার নেপথ্য কারণ হিসেবে ছয়টি বিষয় উপস্থাপন করছি।

১. আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা ও খারাপ মনোবৃত্তি পোষণ করা।

মন্দ ধারণাই হল শিরকের নেপথ্য কারণ। যে কোন শিরকের পেছনে আল্লাহ সম্পর্কে কোন না কোন দোষ-ত্রুটি ও মন্দ ধারণা কাজ করে। ভালবাসার বিপরীত এ মন্দ ধারণা পোষণ করার কারণেই মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করে। গায়রুল্লাহকে তার জন্য আল্লাহর চেয়ে অধিক দয়ালু ও কল্যাণকামী মনে করে। আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা মহাপাপ। এর জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন –

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّيْنَ بِاللهِ ظَنَّ

السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ

وَسَاءَتْ مَصِيْرًا – (سورة الفتح-٦)

অর্থাৎ - "এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন। অমঙ্গল চক্র তাদের জন্য। আল্লাহ তাদের উপর রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন, তা কত নিকৃষ্ট আবাস।

(সূরা আল ফাতহ- ৬)

মুশরিকদের এ মন্দ ধারণার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে তাওহীদের ইমাম ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও মূর্তি পূজারী জাতির সামনে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন পবিত্র কুরআনে তা এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

مَاذَا تَعْبُدُوْنَ   أَإِفْكاً آلِهَةً دُوْنَ اللهِ تُرِيْدُوْنَ   فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

(سورة الصافات– ٨٥–٨٧)

অর্থাৎ - "তোমরা কিসের পূজা করছ ? তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা অলীক মা'বুদগুলোকে চাও ? তাহলে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী ?

(সূরা সাফ্‌ফাত-৮৫-৮৭)

এ কথার মর্ম হলো, তোমরা রাব্বুল আলামীনের মধ্যে কী ধরনের দোষ-ক্রটি ও মন্দের ধারণা পোষণ করছ ? যার ফলে তাঁকে পরিত্যাগ করেছ এবং তাঁর পরিবর্তে এতসব মা'বুদ ও দেবতা বানিয়ে নিয়েছ ? আল্লাহর সত্তা তাঁর গুণাবলী ও কার্যাবলী সম্পর্কে তোমরা কী ধরনের খারাপ মনোবৃত্তি পোষণ করছ? কী ধরনের দোষ-ক্রটি তাঁর মধ্যে আছে বলে ধারণা করছ ? কী ধরনের অক্ষমতা, অপারগতা, করুণার অভাব তাঁর মধ্যে আছে বলে তোমরা মনে করছ? যার ফলে সরাসরি তাঁর ইবাদত না করে ভায়া ও মাধ্যমের পূজা করছ এবং তাদের কাছেই কল্যাণের প্রত্যাশা করছ ? এবং অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের শরণাপন্ন হচ্ছ ?

বস্তুত মুশরিকরা মনে করে যে, আল্লাহ তাদেরকে দয়া করবেন না। এজন্যই তারা মাধ্যম ও ভায়া মা'বুদের ইবাদত করে। আল্লাহর নিকট এসব ভায়া মা'বুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তাদেরকে ভাল না বাসলেও ভায়া মা'বুদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের কল্যাণ করতে বাধ্য। ভায়া মা'বুদরা সুপারিশ করলে সে সুপারিশ আল্লাহ বাতিল করতে পারেন না। এর জবাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন-

يٰأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ
يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ
ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ * مَا قَدَرُوْا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ –

(سورة الحج– ٧٣–٧٤)

অর্থাৎ- "হে লোকসকল একটি উপমা বর্ণনা করা হল। অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা বুঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।"

(সূরা আল হাজ্জ-৭৩-৭৪)

যারা সম্মিলিত শক্তি দিয়ে একটি মাছি সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। মাছি তাদের কিছু ছিনিয়ে নিলে তা উদ্ধার করতেও সক্ষম নয়। তারা তোমাদের জন্য কি কল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে ? অথবা তোমাদের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকে নিজ ক্ষমতাবলে কিইবা উদ্ধার করে আনতে পারে ? মাছির কাছে যারা পরাজিত, মহাশক্তিধর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে তারা কীভাবে বিজয়ী হতে পারে ? আল্লাহর কাছ থেকে কিছু উদ্ধার করে আনা তো দূরের কথা, তাঁর সন্তুষ্টি ও অনুমোদন ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতাও কারো নেই।

আল্লাহর রহমান নামের অর্থ হল স্বভাবগত দয়ালু, করুণায় পরিপূর্ণ সত্তা। যাঁর দয়া পাবার জন্য কোন ভায়া বা মাধ্যমের সুপারিশের কোনই প্রয়োজন নেই। তিনি স্বভাবগতভাবেই তাঁর সৃষ্টিকে দয়া করেন। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন-

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ – (سورة الاعراف–١٥٦)

অর্থাৎ- "আমার দয়া-তাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত।"

(সূরা আ'রাফ-১৫৬)

নবী ও পুন্যবানদের যে সুপারিশ আল্লাহ তাঁর তাওহীদবাদী বান্দাদের জন্য অনুমোদন করেছেন, তা তো নবী ও পুন্যবানদের রহমত ও করুণা নয় বরং কেবলমাত্র তাঁরই করুণার বহিঃপ্রকাশ। যার মাধ্যমে নবী ও পুন্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর সুপারিশকৃতদের ক্ষমা কিংবা পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহর 'ক্বারীব' নামের অর্থ হল নিকটবর্তী। যিনি জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন, হেদায়েত, সাহায্য-সহযোগিতায় বান্দাদের সরাসরি নিকটে। বান্দা ও তাঁর মধ্যে কোন প্রহরী-দারোয়ান ও পরিষদবর্গ দিয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়নি। তিনি তো দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের মত নন যে, প্রহরী-দারোয়ান ও পরিষদবর্গের অন্তরায় ডিঙ্গিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّى فَإِنِّى قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

(سورة البقرة–١٨٦)

অর্থাৎ- "আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই।" (সূরা বাকারাহ-১৮৬)

ভায়া বা মাধ্যম গ্রহণের কোনই প্রয়োজন নেই। এমনকি তাঁকে ডাকতে বড় শব্দ করে ডাকারও প্রয়োজন নেই। যাকে তোমরা ডাক, তিনি বধির নন, দূরবর্তীও নন। তিনি তো স্বামী সর্ব শ্রোতা, ক্বারীব সন্নিকটবর্তী।''-বুখারী আল্লাহকে এমন মনে করা মস্ত বড় মন্দ ধারণা করার শামিল। আর আল্লাহর সাথে কোন মন্দ ধারণা করাই শিরক ও ধ্বংসের নেপথ্য কারণ। আল্লাহ বলেন-

وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِى ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ

(سورة الفصلت–٢٣)

অর্থাৎ- "তোমাদের ঐ (মন্দ) ধারণা যা তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে পোষণ করতে, তাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে, যার ফলে তোমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছ।" (সূরা ফুস্‌সিলাত- ২৩)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রাহ) বলেন-

فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته و إلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء– (الجواب الكافى لابن القيم–٢٣)

অর্থাৎ- "আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর মধ্যে ভায়া ও মাধ্যমের অনুপ্রবেশ ঘটানো হল তাঁর একত্ববাদ, মা'বুদ হওয়ার বৈশিষ্ট্য ও তাঁর প্রতিপালনের অধিকার ক্ষুন্ন করা ও তাঁর সাথে দোষ-ত্রুটি ও মন্দ ধারণা পোষণ করার নামান্তর।

২. সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করা

অথচ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ – (سورة الشورى–١١)

অর্থাৎ- "তাঁর সমতুল্য কোন কিছুই নেই এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শুরা- ১১)

আল্লাহ আরো বলেন-(سورة الاخلاص–٤)- وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অর্থাৎ- "তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (সূরা ইখলাস- 8)

অন্যত্র তিনি বলেন-(سورة البقرة-٢٢)- فَلاَ تَجْعَلُوْا لله أَنْدَاداً
অর্থাৎ- " তোমরা তাঁর জন্য সমতুল্য সাব্যস্ত করো না ।" (সূরা বাকারা- ২২)
তিনি আরো বলেন-(سورة المريم-٦٥) هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا
অর্থাৎ- "আপনি তাঁর সমনাম কাউকে জানেন ?" (সূরা মারইয়াম- ৬৫)

কিভাবে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করা হয় ?

✪ যে ব্যক্তি তার দু'আ-প্রার্থনা, ভয়, আশা-ভরসা সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করল সে এসব কাজে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সমতুল্য করে ফেলল ।

✪ যে ব্যক্তি তার প্রণয়-বিনয়, দাসত্ব-আনুগত্য সর্বশক্তিমান আল্লাহকে না দিয়ে শক্তিহীন, নিঃস্ব, মুখাপেক্ষী, ব্যক্তিগতভাবে সর্বহারা ও সর্বগুণহীন দাস-দাসীকে দিল সে ঐ দাস-দাসীকে আল্লাহর সমতুল্য করে নিল ।

সার্বভৌম ক্ষমতা, নিরঙ্কুশ মালিকানার অধিকারী, স্বয়ং সম্পূর্ণ, সর্বগুণে গুণান্বিত, সকল দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র, উপমাহীন, তুলনাহীন, সমকক্ষহীন, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন রাব্বুল আলামীনের সাথে গাভী, তুলসি গাছ, মাটি ও খড় কুটোর তৈরী মূর্তি, সৃজিত ও লালিত-পালিত দাসানুদাসদেরকে তুলনা করা কত বড় কদর্য, কুৎসিত, বিশ্রী ও মন্দ তুলনা তা কি আর ভাষায় ব্যক্ত করা যায় ।

✪ নবী, ফেরেশতা, জ্বিন, ওলি-আউলিয়া, পোপ-ফাদার, পুরোহিত, পীর বাবা, খাজা বাবা, দয়াল বাবা, উলঙ্গ ফকির, কবর-মাজারস্থ মৃত ব্যক্তি, মূর্তি-দেবতার কাছে মানুষের লাভ-ক্ষতি, দান ও বঞ্চনার ক্ষমতা আছে বলে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল যে, এসব বিষয়ে তাদেরকে আল্লাহর সমতুল্য করল ।

✪ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করল সে তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল ।

✪ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপর ভরসা করল সে ব্যক্তি তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল ।

✪ যে ব্যক্তি সশ্রদ্ধভাবে আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ করল সে তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল ।

✪ যে ব্যক্তি অহংকার করল, মানুষকে তার প্রশংসা ও তার সামনে বিনয় প্রকাশ করার জন্য বলল, নিজেকে মানুষের আশা-ভরসাস্থল বলে প্রকাশ করল, মুক্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা বলে দাবি করল, আল্লাহর আইন-বিধান

পরিবর্তন করে নিজেই আইন-বিধান তৈরী করল সে নিজেকে আল্লাহর সমতুল্য করল।

✪ যে ব্যক্তি নিজেকে শাহানশাহ (রাজাধিরাজ) নামকরণ করল সে নিজেকে আল্লাহর সমতুল্য করল। রাসূল (সাঃ) বলেন-

أغيظ رجل على الله رجل يسمى ملك الأملاك (الجواب الكافي-١٦٣)

অর্থাৎ- "আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত বিরাগভাজন ব্যক্তি সে'ই যাকে রাজাধিরাজ বলা হয়।"

(আল জাওয়াব আল কাফী লি ইবনিল কাইয়্যিম- ১৬৩)

✪ যে ব্যক্তি আব্দুল কাদের জীলানীকে 'গাওছুল আযম' (বিপদকালে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী) বলল সে তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল এবং তাঁর চেয়েও বড় সাব্যস্ত করল।

✪ যে ব্যক্তি ماشاء الله وشئت 'যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং আপনি চেয়েছেন'একথা কাউকে বলল সে তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি এ কথাটি বললে তিনি তাকে বললেন- أجعلتنى لله ندا অর্থাৎ- "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমতুল্য করে ফেললে ? বরং এক আল্লাহ যা চান (তাই সংঘটিত হয়)।" (নাসাঈ)

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে এ কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন- ماشاء الله ثم شئت অর্থাৎ- "যা আল্লাহ চেয়েছেন অতঃপর আপনি চেয়েছেন।" (নাসাঈ) হাদিসটি বিশুদ্ধ।

শিরককারীদের এসব অমর্যাদাকর সমতুল্যকরণ বাতিল করার উদ্দেশ্যে কুরআনে কারীমের মধ্যে মহান আল্লাহ নিজের জন্য দুটো উপমা উপস্থাপন করেছেন-

প্রথম উপমা ঃ

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُوْنَ اَلْحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ – (سورة النحل-٧٥)

অর্থাৎ- "আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোনো কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির, যাকে আমি নিজ হতে

উত্তম জীবিকা দান করেছি সে তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা কি একে অপরের সমান ? সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য ; অথচ তাদের অধিকাংশই তা জানে না"

(সূরা ঃ নাহ্ল- ৭৫)

দ্বিতীয় উপমা ঃ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلاٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنْ يَّأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ – (سورة النحل–٧٦)

অর্থাৎ- "আল্লাহ আরো উপমা দিচ্ছেন দু'ব্যক্তির ঃ তাদের একজন মূক (বোবা ও বধির), সে কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার প্রভুর বোঝাস্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে ভাল কিছুই করে আসতে পারে না; সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সে আছে সরল পথে?

(সূরা নাহাল-৭৬)

প্রথম উপমাটি ধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর দ্বিতীয় উপমাটি তিনি প্রয়োগ করেছেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ধন ও জ্ঞানে তাঁর সাথে সৃষ্টির কোন তুলনাই চলে না যেমনি চলে না অন্য কোন ক্ষেত্রেও।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে তাদেরই অবস্থা দিয়ে নিজের মর্যাদা ও সমতুল্যহীন হওয়ার বিষয়টি কত সুন্দরভাবেই না বুঝালেন।

মানব সমাজে অক্ষম ও সম্পূর্ণ নিঃস্ব কোন ক্রীতদাস এবং ধনবান, বিত্তশালী দানবীর ব্যক্তিকে মর্যাদার দিক থেকে কেউই এক সমান মনে করে না যেমন, তেমনি মূক, অক্ষম, অপরের উপর বোঝা, কল্যাণকর কাজে যোগ্যতাহীন, মূর্খ-আহমক কোন ব্যক্তিকে একজন সুশিক্ষিত, ন্যায়-নীতিবান জ্ঞানী ব্যক্তির সমান কেউ মনে করে না। মানব সমাজে কি কখনো কোন ব্যক্তি নিঃস্ব, হতদরিদ্র কাঙ্গালের দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কিছু পাবার আশায় যায় ? অথবা কখনো কি কেউ কোন বোবা ও বধির, মূর্খ ও জ্ঞানহীন নাদানের নিকট জ্ঞান শেখার আশায় ধর্না দেয় ? তাই যদি হয় তোমাদের নিজেদের অবস্থা, তবে কীভাবে সকল ধনের নিরঙ্কুশ মালিক, সকল জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিকারী সর্ববিষয়ে ন্যায়নীতিবান মহান আল্লাহকে তাঁর সৃজিত, লালিত-পালিত, নিঃস্ব, জাত মূর্খ, জাত কাঙ্গাল দাসানুদাসদেরকে তাঁর

সমতুল্য করছ ? কীভাবে নিঃস্ব, কাঙ্গাল, জাত ফকিরদেরকে দুআ ইবাদাত নিবেদন করছ ? আমাকে ছেড়ে নিস্প্রাণ লক্ষ্মীর কাছে ধন আর স্বরস্বতীর কাছে জ্ঞান প্রার্থনা করছ। কীভাবে আমার প্রাপ্য মুর্তিকে দিচ্ছ ? এই কি তোমাদের ন্যায় বিচার ! এটাই কি তোমাদের জ্ঞানের পরিচয় ! এটা কি তাঁর আত্মমর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী নয় ? এটা কি নয় সবচেয়ে বড় জুলুম ও অবিচার ?

সৃষ্টিকে আল্লাহর সমতুল্য করা শিরকে আকবার। তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে যার পরিণাম চির জাহান্নাম। এহেন শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিরা জাহান্নামে পতিত হয়ে যে উক্তি করবে কুরআনে তা এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে-

تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ * إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

(سورة الشعراء-٩٧-٩٨)

অর্থাৎ- "আল্লাহর কসম ! আমরা (জাহান্নামবাসী) সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে (পূজিত) রাব্বুল আলামীনের সমতুল্য করেছিলাম।

(সূরা শুয়ারা- ৯৭- ৯৮)

৩. শয়তানকে রাহমানের সমতুল্য করা।

যারা সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সমতুল্য করল তারা প্রকৃতপক্ষে নিকৃষ্ট শয়তানকেই আল্লাহর সমতুল্য করল। এবং সমতুল্যকরণের মাধ্যমে বিশ্বাস, কথা, কর্মগতভাবে তাকেই আল্লাহর সমতুল্য মা'বুদ বানাল। কেননা সকল শিরক ও সমতুল্যকরণের নেপথ্যে প্ররোচনাদাতা ও আহ্বায়ক হল শয়তান। যে কোন গায়রুল্লাহর ইবাদাত করা প্রকৃতপক্ষে শয়তানেরই ইবাদাত করা। কুরআনে বর্ণিত ফেরেশতাদের উক্তি থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন-

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعاً ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهٰـؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ
قَالُوْا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ أَكْـثَرُهُمْ بِهِمْ
مُّؤْمِنُوْنَ - (سورة السبا-٤٠-٤١)

অর্থাৎ- "যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন এরা কি তোমাদেরই ইবাদাত করত ? ফেরেশতারা বলবে, তুমি পবিত্র, আমাদের বন্ধুতো তুমিই, তারা নয়।

তারাতো ইবাদাত করত জ্বিন তথা শয়তানের। এদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।

(সূরা সাবা- ৪০- ৪১)

বুঝা গেল যারা ফেরেশতাদের ইবাদাত করত তারা প্রকৃতপক্ষে ফেরেশতাদের ইবাদাত করত না। কেননা ফেরেশতারা কখনো তাদেরকে নিজেদের ইবাদাত করতে বলেনি। ফেরেশতাদের ইবাদাত করার কুমন্ত্রণা ও নির্দেশ দিয়েছে শয়তান। ফেরেশতাদের নামটি ব্যবহার করে পেছন থেকে ইবাদাত নিয়েছে মূলতঃ ইবলিস। অতএব ফেরেশতার ইবাদাত মানে ইবলিসের ইবাদাত। তেমনি গায়রুল্লাহর যে কোন ইবাদাত মানে শয়তানের ইবাদাত। আল্লাহ বলেন-

إِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُوْنَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَّرِيْداً – (سورة النساء–١١٧)

অর্থাৎ- "তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর (প্রতিমা) ইবাদাত করে এবং (প্রকৃতপক্ষে) তারা শুধু শয়তানের ইবাদাত করে।"

(সূরা নিসা- ১১৭)

আল্লাহর কাছে শিরক সর্বাধিক ঘৃণিত মহাপাপ হওয়ার মূল কারণ এটিই। এতে তাঁর শত্রু শয়তানকে তাঁর সমতুল্য করে ফেলা হয়।

৪. শিরক আল্লাহর অস্তিত্ব কিংবা গুণরাজি, কার্যাবলী ও ইবাদাত অস্বীকার করার নামান্তর।

যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে, শিরকের পরিণামে তারা সকলেই নাস্তিক। যদিও শিরক মানে নাস্তিকতা নয়। শিরক মানে আল্লাহর গুণরাজি, কার্যাবলী ও ইবাদাতের তাওহীদকে ধ্বংস করে অংশীবাদী হওয়া। অংশীবাদী মুশরিক আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও আল্লাহ তা বাতিল করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ –(سورة الزمر–٦٥)

অর্থাৎ- "নিশ্চয় তুমি যদি শিরক কর তবে তোমার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। এবং তুমি হয়ে যাবে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।"

(সূরা যুমার- ৬৫)

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ শিরককারীর সমস্ত আমল বাতিল করে দিয়েছেন। আমল বলতে অন্তরের বিশ্বাস, রসনার স্বীকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সকল ক্রিয়াকর্মকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস করা

অন্তরের আমল। মুশরিকের অন্তরে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি যে বিশ্বাস রয়েছে, আল্লাহ শপথ করে তা বাতিল ঘোষণা করলেন। অতএব শিরককারী আল্লাহর বিচারে নাস্তিকও বটে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হতে হবে সর্বাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ। খণ্ডিত বিশ্বাস অবিশ্বাসের নামান্তর। যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করল কিন্তু তাঁর সুন্দর নামসমূহ, তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলী ও কার্যাবলী এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে তাওহীদসমূহ রয়েছে, তার কোন একটি স্বীকার করল না সে যেন এ অস্বীকৃতির মাধ্যমে আল্লাহর পুরো অস্তিত্বকে অস্বীকার করল। এ জন্য সকল মুশরিকই পরিণামের বিচারে নাস্তিক এবং জাহান্নামী। আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ফিরআউন এবং তাওহীদ অস্বীকারকারী মুশরিকের একই পরিনাম।

৫. শিরক আল্লাহর আত্মমর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

শিরক মানে আল্লাহর সমস্ত মর্যাদা অস্বীকার করা। আল্লাহ বলেন-

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ -(سورة الزمر-٦٧)

অর্থাৎ- "তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র মহান তিনি। তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্দ্ধে। (সূরা যুমার -৬৭)

আয়াতে উল্লেখিত حق قدره অর্থ যথাযথ মর্যাদা, যেরূপ মর্যাদা দিতে হয় সেরূপ মর্যাদা। পরিপূর্ণ, অবিভাজ্য, অংশীদারমুক্ত মর্যাদা। যে মর্যাদার অপর নাম তাওহীদ, একত্ববাদ, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। যে শিরক করল সে তাঁর মর্যাদা খণ্ডিত করল- ভাগ করল, তাঁর মর্যাদার একাংশ অন্যকে দিল এবং তাঁকে দিল আংশিক মর্যাদা। আল্লাহ কারো দেয়া আংশিক মর্যাদা গ্রহণ করেন না। তাঁর মর্যাদা আংশিক ক্ষুন্ন করা মানে সম্পূর্ণ ক্ষুন্ন করা। তাই যে তাঁকে আংশিক মর্যাদা দিল সে যেন তাঁকে কোন মর্যাদাই দিল না। এ জন্যই আল্লাহ حق قدره যথাযথ মর্যাদার শর্ত আরোপ করেছেন।

আল্লাহ শিরককারীর দেয়া ইবাদাত পুরোটাই শরীককে দিয়ে দেন। নিজে শিরক মিশ্রিত ইবাদাতের কিছুই গ্রহণ করেন না। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন-

أنا خير شريك فمن أشرك معى شريكا فهو لشريكى يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عزوجل فإن الله لا يقبل من الأعمال ألا ما أخلص له ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شئ ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فأنها لوجوهكم وليس لله منها شئ (بزار، قال الذهبى أسناده لا بأس به)

অর্থাৎ- "আমি বড় উত্তম শরীক, যে ব্যক্তি আমার সাথে কাউকে শরীক করবে তার আমল পুরোটাই আমার শরিকের। হে মানব সমাজ ! তোমাদের আমলগুলো মহান আল্লাহর জন্য অংশমুক্ত কর। কেননা আল্লাহ নির্ভেজাল অংশমুক্ত আমল ছাড়া কোন আমলই গ্রহণ করেন না। তোমরা বল না এ আমল আল্লাহর জন্য এবং আত্মীয়তার (বা আত্মীয়দের) জন্য। এমন বললে তা আত্মীয়তার (বা আত্মীয়দের) জন্যই হবে। তার কিছুই আল্লাহর জন্য হবে না। তোমরা এরূপও বল না এটা আল্লাহর জন্য এবং তোমাদের জন্য। এরূপ বললে পুরোটাই তোমাদের জন্য হবে। তার কিছুই আল্লাহর জন্য হবে না।" (মুসনাদে বায্‌যার)

ইমাম যাহাবী বলেন এ হাদীসের সনদে কোন দোষ নেই।

৬. আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতা।

শিরকের কারণসমূহের মধ্যে এটি হল জননী ও মাতৃ কারণ। আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতাই শিরক ও তার কারণসমূহের জননী। আল্লাহ বলেন-

أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُوْنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ (سورة الزمر-٦٤)

অর্থাৎ- "বলুন, হে মূর্খরা ! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করতে আদেশ করছ ?"

(সূরা যুমার- ৬৪)

আল্লাহ ও তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে মূর্খতা সবচেয়ে বড় মূর্খতা। আর আল্লাহ ও তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে জ্ঞান সবচেয়ে বড় জ্ঞান। এ জ্ঞানই দূর করবে শিরক রূপ মূর্খতা। আল্লাহ বলেন-

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ (سورة محمّد-١٩)

অর্থাৎ- জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই।

(সূরা মুহাম্মদ-১৯)

উপসংহার ঃ উপরোল্লেখিত বিষয়গুলোই শিরক ও তার বীভৎসতার মূল কারণ। যার প্রেক্ষিতে আল্লাহর কাছে শিরক সবচেয়ে ঘৃণিত, কদর্য, জঘন্য মহাপাপ এবং সবচেয়ে বড় অবিচার বা জুলুম। বিশ্বজগতের সকল বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের এটিই হল মূল কারণ। এ ভয়াবহ পাপ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ কাজ নয়। সেজন্য সর্বদাই আল্লাহর কাছে শিরক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ও কৃত শিরকের জন্য তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। তাওবা ব্যতীত শিরকের কোন ক্ষমা নেই।[১]

শিরক সম্পর্কে যার জ্ঞান নেই তার তাওহীদের সংরক্ষণ অসম্ভব। তার কষ্টার্জিত সব ইবাদাত-বিশ্বাস, কথা ও কর্ম শিরকের কারণে যেহেতু অনিবার্য ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব তাওহীদের জ্ঞানের পাশাপাশি শিরক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য।[২] জ্ঞানের আলোতে অন্তর চক্ষু দিয়ে দেখে নিতে হবে তাওহীদের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ ও মহিমা। একই সাথে দেখে নিতে হবে শিরকের ঘৃণিত, কুৎসিত, বিভৎস চেহারা। তাওহীদের সোপানে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করলে তাওহীদকে মনে হবে রূপ লাবণ্য ভরা সুরভিত জান্নাতুল ফেরদাউস। পক্ষান্তরে শিরকের বিভৎসতা অবলোকন করলে মনে হবে, এ বুঝি হাবিয়া জাহান্নাম। এ জাহান্নামে যারা পড়ে আছে তারা কি মানুষ ! কই তাদের মানবীয় চেহারা ?! এরা মানুষ নয়। আল কুরআন এদের মনুষ্যত্বের অভিধা অস্বীকার করেছে। আল্লাহ বলেন-

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ -(سورة الاعراف-١٧٩)

অর্থাৎ- "তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর।"

(সূরা আ'রাফ- ১৭৯)

---

[১] এজন্য রাসূল সা. সকাল-সন্ধ্যা তিন বার এই দুআ পাঠ করতে বলেছেন :

اللهم اني اعوذبك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لااعلم

হে আল্লাহ আমার জানা অবস্থায় আপনার সাথে শিরক করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর অজানা অবস্থায় (শিরক) হয়ে গেলে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।
(আহমদ ও তাবারনি)

প্রথম প্রশ্ন ও উত্তর

ভূমিকা ঃ বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র ইসলামী জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ জাগরণের সফলতা নির্ভর করছে সঠিক আক্বিদা-বিশ্বাসের উপর। আর বিশুদ্ধ আক্বিদা হচ্ছে তা-ই যা হবে কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর, সকল প্রকার শিরক, বিদায়াত, ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিমুক্ত। মূলত ঃ যারা সহীহ আক্বিদার অধিকারী হয় তারাই সঠিক পথের অনুসারী। এ আক্বিদাই তাদের জ্ঞান, দাওয়াত ও যাবতীয় কার্যাবলীকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। একমাত্র বিশুদ্ধ আক্বিদাই স্থান, কাল ও মাজহাবের পার্থক্য দূরীভূত করে বিশ্ব মুসলিমকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে পারে। বস্তুত আক্বিদা কোন গবেষণাপ্রসূত বিষয় নয় বরং এটা কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভরযোগ্য দলিল-প্রমাণাদির মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত। এ জন্যেই চার মাজহাবের সম্মানিত ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) ও হাদিস শাস্ত্রের ইমাম বোখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) ও অন্যান্য সকল ইমামগণের মধ্যে আক্বিদাগত কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাদের সবারই আক্বিদা ছিল আখেরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের আক্বিদারই অনুরূপ।

প্রশ্ন ঃ তাওহীদ কী ? এটা কত প্রকার ও কী কী ? তাওহীদের কোন প্রকারটি ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে ? তাওহীদের কোন প্রকারের দাওয়াতের জন্য সকল নবী ও রাসুল প্রেরিত হয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ

الحمد لله رب العالمين أحمده حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد أن لا إله إلا الله قيوم السموات والأرضين وأسلم على رسوله محمد خاتم الانبياء و المرسلين و على أله وصحبه أجمعين وبعد –

উপস্থাপনা ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রুবুবিয়্যাত দ্বারা আমাদেরকে সৃষ্টি ও লালন-পালন করে তারপর নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর উলুহিয়্যাত তথা

ইবাদাত ও আনুগত্যে একত্ববাদী হওয়ার। তিনি রব হয়ে সব নেয়ামত দান করলেন, আর ইলাহ হয়ে সব ইবাদাত বান্দার কাছে দাবি করলেন। কেননা বান্দাহ তাঁর নেয়ামতের প্রতি যত মুখাপেক্ষী তার চেয়ে অনেক বেশি মুখাপেক্ষী তাঁর ইবাদাতের প্রতি। ইহকাল ও পরকালে বেঁচে থাকা ও সফল হওয়ার জন্যে তাঁর নেয়ামত ও ইবাদাতের প্রতি বান্দাহ যৎপরোনাস্তি মুখাপেক্ষী। খাদ্য, পানি অক্সিজেন না পেলে ইহজীবনটি যেমন ধ্বংস হয়ে যাবে, তেমনি ইবাদাত-বন্দেগী না করলে ধ্বংস হয়ে যাবে বান্দার চিরস্থায়ী পারলৌকিক জীবন। তাই বান্দাকে তিনি শেখালেন একথা বলতে-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ – (سورة الفتحة–٤)

"একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই সকাশে সাহায্য প্রার্থনা করি।"

(সূরা আল-ফাতেহা-৪)

কবি গোলাম মোস্তফা এর কী সুন্দর ভাবানুবাদই না করলেন !-

"দ্যুলোকে ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি
তোমারি করুণাকামী।"

ইবাদাত (দাসত্ব) ও ইসতিয়ানাতকে (সাহায্য প্রার্থনা) আল্লাহর জন্যে একমাত্রিকভাবে সীমাবদ্ধ করে দেয়ার নামই হচ্ছে তাওহীদ। এ একমাত্রিকতা বিরাজমান না থাকলে এ দু'টো হারিয়ে যাবে শিরকের অন্ধকারাচ্ছন্ন অতল গহ্বরে। আল্লাহ আমাদেরকে শিরকমুক্ত, তাওহীদদীপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন !

এবার আমরা বক্ষমান প্রশ্নোত্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বর্ণনা করতে প্রয়াস পাবো। (ইনশাআল্লাহ)

তাওহীদ কী ?

শুধু তাওহীদ বলতে- তাওহীদে মুতলাক বা অবিভক্ত তাওহীদকে বুঝায়। যার অর্থ- একত্ববাদ, একত্বে ভূষিত করা। তাওহীদদীপ্ত আলেম সমাজ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাওহীদকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করেছেন।

১. তাওহীদ হল- কায়মনোবাক্যে এ সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, সকল বিষয়েই আল্লাহ এক ও একক, অদ্বিতীয়, নিরূপম, সমকক্ষহীন, তুলনাহীন।

তিনি ব্যক্তি সত্তা, কর্মরাজি, সুন্দর নামসমূহ ও গুণাবলী এবং ইবাদাতের সার্বভৌম অধিকারে সম্পূর্ণ এক ও একক। তেমনিভাবে তিনি একত্বের অধিকারী সৃষ্টিকর্মে ও নির্দেশদানে। (শরহুল আক্বিদাহ আত্ তাহাবিয়্যাহ)

২. তাওহীদ হচ্ছে- আল্লাহর লেশমাত্র দোষহীন পরিপূর্ণ গুণরাজিতে আল্লাহর একত্বের হৃদয়গত ইল্ম ও বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। (কিতাবুত্ তাওহীদ)

৩. তাওহীদ হচ্ছে- একমাত্র সত্য মা'বুদের জন্যে একমাত্র সত্য দ্বীন ও ঈমানের পথে একাভিমুখী বান্দাহ হয়ে যাওয়া। (ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ)

فلو احد كن واحدا فى واحد

أعنى سبيل الحق والإيمان

(إبن القيم مجموعة التو حيد–١٣٣)

৪. তাওহীদ হচ্ছে- ইবাদাত ও ইসতিয়ানাত তথা দাসত্ব ও সাহায্য প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর সাথে বিশেষিত করা। (কিতাবুত্ তাওহীদ লি ইবনি তাইমিয়্যাহ রহঃ)

তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদের প্রকারভেদের আলোচনাকে আমরা দুটো পর্বে সমাপ্ত করবো। (ইনশাআল্লাহ)

প্রথম পর্ব ঃ- সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ- বিস্তারিত আলোচনা।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অধিকাংশ ওলামায়ে সালাফের মতে মৌলিকভাবে তাওহীদ দু'প্রকার।

১. তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ। রব ও প্রতিপালক হওয়ার ক্ষেত্রে একত্ববাদ।

২. তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ। ইলাহ ও মাবুদ হওয়ার ক্ষেত্রে একত্ববাদ। (কিতাব আত্ তাওহীদ লি ইবনে তাইমিয়্যাহ পৃষ্ঠা-৫৭)

ইমাম ইবনু আবিল হজ্জ 'আকিদা আত্ তাহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেন, যে তাওহীদের প্রতি আল্লাহর রাসুলগণ দাওয়াত দিয়েছেন এবং যে তাওহীদসহ আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছে, তা দু'প্রকার ঃ-

এক. توحيد فى الإثبات والمعرفة বা আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করণ ও পরিচিতি অর্জনের তাওহীদ বা একত্ববাদ।

দুই. توحيد فى الطلب والقصد তথা আল্লাহর নির্দেশ ও বান্দার নিয়্যতের তাওহীদ। প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর জাত, গুণাবলী ও নামসমূহ সাব্যস্ত করণের তাওহীদ। যা পরবর্তীতে রুবুবিয়্যাতের একত্ববাদ এবং নাম ও গুণরাজির একত্ববাদ নামে আখ্যায়িত হয়েছে। এ প্রকারকে التوحيد العلمى الخبرى বা (জ্ঞান ও সংবাদগত একত্ববাদ) বলা হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে- অংশীদার মুক্তহয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি ও সকল পূজিত বাতিল মা'বুদের ইবাদাত পরিহার করার প্রতি দাওয়াত দেয়া। যা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ নামে পরিচিত। ইমাম ইবনু আবিল ইজ্জ বলেন- কুরআনের প্রতিটি সূরাই উক্ত তাওহীদদ্বয়ের আলোচনার উপর শামিল। কেননা কুরআনে মৌলিকভাবে ব্যাপক আকারে এ দুটো বিষয়ই আলোচিত হয়েছে।

১. আল্লাহর জাত, তাঁর নাম, গুনাবলী ও কার্যাবলীর সংবাদ।
২. একমাত্র তাঁর ইবাদাত করার আহ্বান এবং গায়রুল্লাহর ইবাদাত পরিহার করার দাওয়াত।

বিস্তারিত আলোচনা

তাওহীদ তিন প্রকার। যথা ঃ

১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বা রব হওয়ার ক্ষেত্রে একত্ববাদ।
২. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইলাহ হওয়ার ক্ষেত্রে একত্ববাদ।
৩. তাওহীদুয্ যাত ওয়াল আসমা ওয়াস্ সিফাত বা সত্তা, নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে একত্ববাদ।

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাব পরিচয়

রব হিসাবে আল্লাহর একত্ববাদের অর্থ হচ্ছে তাঁর কার্যাবলীতে তাঁর এককত্ব সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ জ্ঞান, বিশ্বাস ও স্বীকৃতিতে একথা মেনে নেয়া যে, আল্লাহই হচ্ছেন বস্তুনিচয়ের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, দৈহিক ও আত্মিক লালন-পালনকর্তা, সার্বভৌম মালিক, বিধান দাতা, মহাব্যবস্থাপক। তাঁর নির্দেশকে রদ করার মত কেউ নেই, তাঁর বিচার-ফায়সালার বিরুদ্ধাচরণ করা কিংবা পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা কারো নেই, মহা বিশ্বের লালন-পালন ব্যবস্থায় তাঁর কোন প্রকৃত বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ – (سورة يونس–٣١)

অর্থাৎ- "তুমি বল ! কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে জীবিকা দান করেন ? কিংবা কে তোমাদের কর্ণ ও চক্ষুর অধিপতি ? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনেন ? আর কেই বা জীবিতের ভেতর থেকে মৃতকে বের করেন ? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা ? তখন তারা বলে উঠবে 'আল্লাহ !' তুমি বল ! তারপরেও ভয় করছ না ?"

(সূরা ইউনুস-৩১)

আধুনিক বস্তু বিজ্ঞানে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা কত সুন্দরভাবেই না ফুটে উঠেছে। সবুজ জীবনময় পৃথিবী তল তাঁরই রুবুবিয়্যাতের এক সাগর দয়ার নিদর্শন। সূর্য রশ্মিকে উদ্ভিদ জগতের উপর ফেলে সালোক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে তিনিই তৈরী করছেন প্রাণী জগতের জন্য খাদ্য ভাণ্ডার। বান্দাদের দুয়ারে দুয়ারে রিযিক পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনিই সৃষ্টি করছেন গভীর সমুদ্রে নিম্নচাপ। তার সাহায্যে দমকা হাওয়া সৃষ্টি করে উদ্ভিদের পুরুষ পরাগ রেণুকে নারী পরাগ রেণুর সাথে সম্মিলিত করছেন। যে সম্মিলনের ফল হল সুস্বাদু বিচিত্র রকমের ফল-মূল, শস্য-দানা আরও কত কী ! চির বাষ্পস্বভাব পানি রাশিকে হাইড্রোজেন চেইন লাগিয়ে তিনিই করেছেন তরল। যাতে তাঁর বান্দারা সুমিষ্ট-সুশীতল পানি পান করে প্রাণ রক্ষা করতে পারে। মৃত এমাইনো এসিডে তিনিই সঞ্চার করেছেন তাঁর নির্দেশিত প্রাণ। সহস্র সহস্র কম্পিউটার বেস স্ক্যানার সমতুল্য নয়নযুগল তাঁরই রুবুবিয়্যাতের এক মহা নিদর্শন। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র শ্রুতিযন্ত্র বিশিষ্ট দুটো কান তাঁরই বান্দাহ পালনের বার্তাবাহক নয় কি?

বস্তুত মহাবিশ্বটি একটি মহা কম্পিউটার। যার স্রষ্টা ও নির্মাতা হলেন মহান রাব্বুল আলামীন, যা অকল্পনীয় সুক্ষতায় তাঁরই প্রোগ্রাম ও নির্দেশে চলমান। দ্বিতীয় কারো হস্তক্ষেপ হলে চোখের পলকেই ধ্বংস নেমে আসত মহাবিশ্ব জুড়ে।

ইরশাদ হচ্ছে-

فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ – (سورة يس–٨٣)

অর্থাৎ- "পবিত্রতা সে মহান সত্তার যাঁর হাতে রয়েছে বস্তু নিচয়ের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও স্বত্বাধিকার। আর তোমরাতো তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।"

(সূরা ইয়াসিন-৮৩)

তাই মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনায় অপর কারো কর্তৃত্ব হস্তক্ষেপের সাংঘর্ষিক বিশ্বাসে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহকে ধ্বংস করলে তা হবে এক বিরাট জুলুম ও অমার্জনীয় অত্যাচার।

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ

ডঃ ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মদ আল-বুরাইকান তাঁর 'আল মাদখাল' নামক গ্রন্থে বলেন- ইলাহ শব্দটি দু'টো অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. মা'বুদ। এটি সত্য ও অসত্য উভয় মা'বুদের উপর প্রযোজ্য।
২. মুতা' বা আনুগত্যের উপযুক্ত। এ শব্দটি সত্য মা'বুদকে যেমনি বুঝায় তেমনি বাতিল মা'বুদকে বুঝায়। তবে পরবর্তীতে এর সমধিক ব্যবহার সত্য মা'বুদের ক্ষেত্রেই হয়েছে। তাই ইলাহের অর্থ দাঁড়াল এমন সত্তা, হৃদয়সমূহ যাঁর ইবাদাত ও আনুগত্য করে ভালবাসা, তা'যীম ও বড়ত্ববোধ সহকারে। তাই শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে তাওহীদুল উলুহিয়্যার সংজ্ঞা হবে-

هو إفراد الله بالعبادة والطاعة أو هو توحيد الله بأفعال عباده

অর্থাৎ- "ইবাদাত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ সাব্যস্ত করা অথবা বান্দার কার্যাবলীতে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যেমন- সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, যবাহ, মান্নত, ভয়, আশা, ভালবাসা এসব কিছুই বান্দাহ করবে শুধু আল্লাহর ইবাদাত, আনুগত্য ও সন্তুষ্টি কামনায়। এর দ্বারা তাওহীদুল উলুহিয়্যায় দুটো মূলনীতির উপস্থিতি অপরিহার্য বলে বুঝা যায়।

ক. সর্বপ্রকার ইবাদাত গায়রুল্লাহকে বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর জন্যেই নিবেদন করতে হবে।

খ. সর্বপ্রকার ইবাদাত তাঁর আদেশ-নিষেধের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। এ দু'মূলনীতিকে ইখলাস ও মুতাবাআত বা বিশুদ্ধতা ও অনুসরণ বলা হয়। যা প্রকৃতপক্ষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর মর্মকথা। অর্থাৎ ইবাদাত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর আর তরীকাহ একমাত্র মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। এ জন্যেই এ তাওহীদ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা জীবন এর দ্বারাই পরিচালিত

হবে এবং শরীয়তের উপরই ভিত্তিকৃত হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভিন্ন আর কারো জন্যে কোন বিধান রচনা ও কোন আনুগত্য দাবি করার অধিকার নেই। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ – (سورة النحل-٣٦)

অর্থাৎ- "আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তোমরা শুধু আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য কর আর তাগুতকে পরিহার কর।"

(সূরাস আন-নাহাল- ৩৬)

এ তাওহীদটি মূলত বান্দার উপর আল্লাহর হক যা আর কারো জন্য সাব্যস্ত হতে পারে না।

মুয়াজ (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه معاذ رضى الله عنه ...

فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا (البخارى و مسلم-٤٤)

অর্থাৎ- " বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হচ্ছে এই যে, তারা তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করবে না।"

(বুখারী ও মুসলিম- ৪৪)

এ তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়াই হল প্রথম ফরজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ (রাঃ) কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় তাকে হিদায়াত করলেন- সর্বপ্রথম যে বিষয়ের দিকে মানুষকে ডাকবে তা হবে- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর সাক্ষ্য। সূরা আল কাফিরূনে উক্ত তাওহীদের দিকেই ডাক দেয়া হয়েছে। এবং পৌত্তলিকতা ও পৌত্তলিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রঃ) তাঁর "কায়েদাতুন জামেয়া ফি তাওহীদিল্লাহ ওয়া ইখলাছিল আমল ওয়াল ওয়াজহে লাহু" নামক পুস্তিকায় তাওহীদুল উলুহিয়্যার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক অনেক তথ্য ও যুক্তির সমাহার ঘটিয়েছেন। আমরা সেগুলোর কিছু সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরছি।

১. * আল্লাহই মানুষের হৃদয়ের মাকসুদ, হৃদয় শুধু আল্লাহকেই চায়।
 * এ মাকসুদ তথা আল্লাহকে পেতে তিনিই সাহায্যকারী।
 * গায়রুল্লাহ হৃদয়ের কাছে অনাকাংখিত।
 * এ অনাকাংখিত গায়রুল্লাকে হৃদয় থেকে দূর করতে আল্লাহই সাহায্যকারী।

উপরোক্ত চারটি বিষয় শুধু আল্লাহর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই ইবাদাত তাঁরই করতে হবে। সাহায্য তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হবে। আর এই হচ্ছে- "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়িন"-এর মর্ম।

২. মানুষ আল্লাহর সৃজন ও রুবুবিয়্যাতের প্রতি যতটা মুখাপেক্ষী তার চেয়ে অনেক বেশি মুখাপেক্ষী তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্যের প্রতি। কেননা ইবাদাতই হচ্ছে তার সৃষ্টি ও জীবনের লক্ষ্য। যা ব্যতীত তার জীবন নিষ্ফল ও ব্যর্থ বরং ভয়াবহ শাস্তিযোগ্য।

৩. সৃষ্টির কাছে বান্দার কল্যাণ ও অকল্যাণের, দান-বঞ্চনার কোন কিছুই নেই। কেউ সন্তুষ্ট হলেই বান্দার উপকার করতে পারবে না যদি আল্লাহ তা মঞ্জুর না করেন, আবার ক্ষতিও করতে পারবে না যদি তিনি তা অনুমোদন না করেন। পক্ষান্তরে তিনি বান্দার কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে চইলে তা রুখবার মত কেউ নেই। সুতরাং অক্ষম গায়রুল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করে কী লাভ ?

৪. আল্লাহর ইবাদাতের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন, সৃষ্টির সাথে তার চেয়ে অধিক সর্ম্পক রাখা বান্দার জন্যে ক্ষতিকর। যেমনিভাবে ক্ষতি করে অতিরিক্ত খাদ্য-পানীয়। তাই আল্লাহর দিকেই ধাবিত হওয়া উচিৎ। এবং সৃষ্টির সাথে ভালবাসা ও সম্পর্ক তাঁর দ্বীনের জন্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেই হওয়া উচিৎ।

৫. অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, বান্দা আল্লাহ ছাড়া কারো উপর ভরসা করলে কিংবা কারো আশা করলে নিরাশা আর ব্যর্থতাই হয় তার পাওনা। তাই সকল আশা-ভরসা আল্লাহর উপরই করতে হবে। এতেই রয়েছে বান্দার কল্যাণ। এর ব্যতিক্রম করলে অকল্যাণ ও ধ্বংসই হবে তার প্রাপ্য।

৬. আল্লাহ নিজে অভাবমুক্ত, পরম উদার, বড়ই করুণাময়। কোন প্রয়োজন ছাড়াই তিনি বান্দার উপকার করেন। তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আর বান্দার প্রতি অন্য বান্দার ভালবাসাতো কোন না কোন স্বার্থেই হয়ে থাকে। রাজার সৈন্যবাহিনী, মুনীবের দাস-দাসী, শিল্পপতির শ্রমিক-কর্মচারি, নেতার গুনগ্রাহী সকলেই কোন না কোন স্বার্থে তাদেরকে ভালবাসে। অবশ্য ভালবাসা আল্লাহর জন্যে হলে তা এর চেয়ে ব্যতিক্রম। এ ছাড়া সকল ক্ষেত্রেই নিজ স্বার্থে একে অপরকে ভালবাসে। যে ব্যক্তি একজনকে তার বীরত্ব, নেতৃত্ব, সৌন্দর্য ইত্যাদির কারণে ভালবাসল, সে

তাকে এ জন্যেই ভালবাসল যে, তার এ সুন্দর গুণগুলো তার মনে আনন্দ দিয়েছে। সে এগুলোকে উপভোগ করেছে। এটা কি কম স্বার্থের কথা ? মোটামুটি বলা যায়, প্রায় সকল সৃষ্টিই সুসময়ের বন্ধু, বসন্তের কোকিল। স্বার্থ শেষ হলে ভালবাসাও শেষ হয়ে যায়। তাই নিঃস্বার্থ আল্লাহই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। তিনি বান্দার উপকারের জন্যেই বান্দাকে কাছে নিতে চান। যাতে শুধু বান্দারই উপকার। এ সত্যটি বুঝলে তা আপনাকে মাখলুকের কাছে আশা করা থেকে বিরত রাখবে। তবে মানুষের স্বার্থপরতার কারণে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করাও ঠিক হবে না। বরং আল্লাহর জন্যে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৭. অধিকাংশ মানুষ আপনাকে দিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে চাইবে। যদিও তা আপনার জন্যে ক্ষতিকর হয়। কারণ প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তি অন্ধ। সে প্রয়োজন পূর্ণ করা ছাড়া আর কিছু বুঝে না।

৮. আপনি কোন ভয়, ক্ষুধা ও রোগে আক্রান্ত হলে সৃষ্টিকুল আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া তা প্রতিহত করতে পারবে না। আর তারা নিজের কোন স্বার্থ ছাড়া তা দূর করার ইচ্ছেও করবে না।

৯. সৃষ্টি যেহেতু আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত আপনার কোনই কল্যাণ-অকল্যাণ করতে পারে না। তাই আপনার আশা ও ভয় আল্লাহর সাথেই সংযুক্ত করুন।

১০. আপনি নিজেই নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ যথোচিতভাবে বুঝেন না। তাহলে কীভাবে অপর কোন সৃষ্টি আপনার কল্যাণ-অকল্যাণ বুঝবে ? আল্লাহ এসবই জানেন আর তিনি সক্ষমও বটে। তিনি আপনাকে তাঁর বিরাট অনুগ্রহ দান করতে সক্ষম। তাই একমাত্র তাঁরই ইবাদাত ও আনুগত্য করা উচিৎ নয় কি?

ডঃ খালুক নূর বাকী " الإنسان ومعجزة الحياة " 'আল-ইনসান ওয়া মু'জেজাতুল হায়াত'নামক গ্রন্থে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল বর্ণনা করে বলেন- মানুষের সকল মানসিক ও স্নায়ুবিক বিশৃঙ্খলার মূল কারণ হল ভয়-ভীতি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا —

(سورة ال عمران–١٥١)

অর্থাৎ- " আমি অচিরেই কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত করব এ জন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে অংশীদার করেছে যার কোন দলীল আল্লাহ নাযিল করেননি ।"

(আলে ইমরান- ১৫১)

ভয় এমন মারাত্মক যে, তা মানুষেরে দেহের অভ্যন্তরের সকল কম্পিউটার, বায়োলজিক, রাসায়নিক ও ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাপনাকে বিকল করে দেয় এবং এ ভয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি তার লব্ধ তথ্য ও জ্ঞান থেকে কোন ফলাফলে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। এবং অবাস্তব ভীতিকর বিষয়সমূহের কল্পনা করতে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَإِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُوْنَ - (سورة ال عمران-١١١)

অর্থাৎ- "তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অতঃপর তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।"

(সূরা আলে ইমরান-১১১)

ভয়ের কারণে পালানোর চিন্তা ছাড়া আর কী উপায়ই বা তাদের থাকতে পারে ? এ ভয় থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, পূর্ণ আস্থা ও ভালবাসা। পরীক্ষার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, আস্থা ও ভালবাসা মানুষের ভেতরের কম্পিউটার ব্যবস্থাপনাকে সাবলীল করে। আর ঘৃণা ও বিদ্বেষ একে স্থবির করে দেয়। বস্তুত মহান স্রষ্টা মানবদেহ নামক এ কারখানার ব্যবস্থাপনাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস, তাওয়াক্কুল ও ভালবাসার সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। তাই তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্য ব্যতীত এ কারখানা সঠিকভাবে চলতেই পারে না। এ জন্যেই কাফের, নাস্তিক, পৌত্তলিকদের এইডস্, হৃদরোগ, হার্টের শিরা-উপশিরা বন্ধ হয়ে যাওয়া, পাকস্থলির আলসার ও একজিমার মতো জটিল চর্মরোগ, বিভিন্ন অন্ত্ররোগ ও হরমোনজনিত ব্যাধিসমূহ অনেক বেশি হয়ে থাকে।

৩. তাওহীদুয্ জাত ওয়াল আসমা ওয়াস সিফাত তথা সত্তা, নাম ও গুণরাজির একত্ববাদ। সত্তাগত একত্ববাদের অর্থ হল তিনি তাঁর সত্তায় অবিভাজ্য ও গুণরাজিতে অনুপম এবং কার্যাবলীতে অংশীদারহীন। ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ(٤)

(سورة الاخلاص)

অর্থাৎ- "বলুন ! তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

(সূরা ইখলাস)

আর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে একত্ববাদের অর্থ হচ্ছে- আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহতে আল্লাহর যে সব সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেয়া। কোন অবস্থাতেই আল্লাহর গুণ অস্বীকার করা, এসবের বিকৃত অর্থ করা, উপমা ও ধরন বর্ণনা করা যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ – (سورة الشورى–١١)

অর্থাৎ- "তাঁর মত কোন কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"

(সূরা ঃ শূরা- ১১)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

اللهُ لَا إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى – (سورة طه–٨)

অর্থাৎ- "আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তাঁর জন্যেই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ।"

(সূরা ত্বাহা- ৮)

ওলামায়ে সালাফ আল্লাহর 'হ্যাঁ' বাচক গুণরাজিকে সবিস্তারে বর্ণনা করেন। আর না বাচক গুণরাজিকে বর্ণনা করেন সংক্ষিপ্তভাবে। কেননা কুরআনে এমনটিই করা হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে আল্লাহর সিফাত দু'প্রকারঃ

১. صفات ثبوتية বা ইতিবাচক গুণরাজি যা আল্লাহর সত্তায় বিরাজমান কোন গুণকে বুঝায়।

২. صفات سلبية বা নেতিবাচক গুণরাজি যা পরিপূর্ণ গুণের পরিপন্থী বিষয়কে আল্লাহর জাত থেকে দূর করে এবং তাঁর বিপরীত ইতিবাচক গুণকে তাঁর জন্য সাব্যস্ত করে।

ইতিবাচক গুণরাজি আবার দু'প্রকার

ক. صفات ذاتية বা সত্তাগত গুণরাজি। যেগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ও ইরাদার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাঁকে এসব গুণরাজি থেকে কখনো শূন্য কল্পনা করা যায়

না। সর্বদাই এগুলোতে তিনি গুণান্বিত থাকেন। যেমন ঃ- হায়াত, কুদরত, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি।

খ. صفات فعلية বা কার্যগত গুণরাজি। যা তাঁর ইচ্ছে ও ইরাদার সাথে সম্পৃক্ত। এসব গুণ যখনই তিনি ইচ্ছে করেন প্রকাশ করেন আবার যখন ইচ্ছে পরিত্যাগ করেন। অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এ ভাবেই এ গুণরাজি বিদ্যমান ছিল, আছে এবং থাকবে। যেমনঃ- আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া, হাসি, বিস্ময়, শেষ রাতের তৃতীয় প্রহর ও আরাফার দিনে প্রথম আকাশে অবতরণ ইত্যাদি। এসব গুণের শুধু আভিধানিক অর্থই আমাদের জানা এর বাইরে আর কিছুই জানা নেই। আল্লাহ কেমন ? এ প্রশ্নের উত্তর যেমন আমাদের কাছে নেই, আল্লাহর গুণরাজি কেমন এ প্রশ্নের উত্তরও আমাদের কাছে নেই। অর্থাৎ তাঁর গুণরাজি আছে বলে আমরা জানি কিন্তু সেগুলো কিরূপ এটা জানি না। কেননা মাওসুফ বা গুণান্বিতের প্রকৃতি জানলেই সিফাত বা গুণের প্রকৃতি জানা সম্ভব হয়। অন্যথায় সম্ভব নয়। এ জন্যই এগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদয়াত। ওলামায়ে সালাফ আল্লাহর গুণরাজি সম্পর্কে বলতেন- أمروها كما جائت অর্থাৎ- "এগুলো যেমনি বর্ণিত হয়েছে তেমনিই চালিয়ে দাও।" এ আক্বিদা বিশ্বাস থেকে আল্লাহর নাম ও গুণরাজিকে বিচ্যুত করে কোন বাতিল অর্থের দিকে নেয়া যাবে না। যেমন ঃ- মক্কার কাফের সম্প্রদায় ইলাহ থেকে লাত, আজিজ থেকে ওজ্জা, মান্নান থেকে মানাত মূর্তির নামকরণ করে। এ ভাবে তারা আল্লাহর নামকে মূর্তির নামের সাথে যুক্ত করে কুফর করেছিল। মুসলিম সমাজেও কোন কোন ভ্রান্ত দল আল্লাহর গুণরাজিকে সৃষ্টির গুণের সাথে তুলনা করে অথবা তাঁকে গুণহীন মনে করে। এ ভাবে তারা তাঁর আসমা ও সিফাতকে নিরর্থক করে দেয়। অপর একটি দল তাঁর গুণরাজিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। এ সবই তাওহীদের পরিপন্থী।

(আল মাদখাল, মাজমুউল ফাতাওয়া লি ইবনে তাইমিয়্যাহ- ৯১-৯২)

তাওহীদের কোন প্রকারটি ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে ?

'তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ'ই ঈমান ও কুফরের মধ্যে যুদ্ধের মূল কারণ। রুবুবিয়্যাতের তাওহীদকে প্রায় সকল কাফের জাতি স্বীকার করেছে। আল্লাহকে স্রষ্টা, জীবন-মৃত্যু, জীবিকা ও নেয়ামতদাতা হিসেবে তারা সকলেই স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু– যখনই তাদেরকে বলা হত আল্লাহ ছাড়া কাউকে

ডেকো না, কোন ভায়া মা'বুদ সাব্যস্ত করো না, কারো কাছে আশা, ফরিয়াদ, বিপদে পরিত্রাণ কামনা করো না, এক কথায় আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত কারো না তখন তারা বলত-

أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَـٰهاً وَّاحِداً إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ- (سورة ص-٥)

অর্থাৎ- "সে কি বহু মা'বুদের পরিবর্তে এক মা'বুদের ইবাদাত সাব্যস্ত করে দিয়েছে ? নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।" (সূরা সোয়াদ - ৫)

ইবাদাতের তাওহীদকে অস্বীকার করার কারণেই তাদের জান-মালকে আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। তাওহীদুর রুবুবিয়্যার স্বীকৃতি তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায়নি। প্রকৃতপক্ষে তাওহীদুল উলুহিয়্যাই হচ্ছে ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী। এ জন্যই কালেমায়ে তাইয়্যেবায় আল্লাহর গুণবাচক নাম 'রব' উল্লেখ না করে 'ইলাহ'কে উল্লেখ করা হয়েছে। "লা রাব্বা ইল্লাল্লাহ" না বলে বলা হয়েছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। কেননা আল্লাহর রব হওয়ার একত্ব তারা স্বীকার করত, কিন্তু মা'বুদ হওয়ার একত্ব তারা স্বীকার করত না। আল্লাহর নেয়ামত গ্রহণের বেলায় তারা একত্ববাদী কিন্তু আল্লাহকে ইবাদাত দেয়ার বেলায় তারা ছিল বহুত্ববাদী। বর্তমান সমাজে আল্লাহর গুণগান ও মহিমা কীর্তনের লোকের অভাব নেই। কিন্তু যখনই বলা হয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন বিধানকে মেনে চলতে হবে তখনই শুরু হয় তাদের পিছুটান। এ ক্ষেত্রে আরবের কাফেরদের মতই তারা আল্লাহর দাসত্বকে অস্বীকার করে। এ ধরনের লোকেরা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুসলিম তো সে'ই যে স্বীকার করে- আল্লাহ ছাড়া যেমন কোন নেয়ামতদাতা নেই তেমনি সৃষ্টিকুলের ইবাদাত, দাসত্ব, আনুগত্য পাবার যোগ্য আর কেউ নেই।

তাওহীদের কোন প্রকারের জন্য নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন ?

তাওহীদুল উলুহিয়্যার প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্যেই নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلاَّ نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنَ

(سورة الانبياء-٢٥)

অর্থাৎ- "আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই সুতরাং আমারই ইবাদাত কর।"

(সূরা আম্বিয়া-২৫)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

وَإِلَى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوْا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ

(سورة الاعراف-٧٣)

অর্থাৎ- "আমি সামুদের প্রতি প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে, সে বলল- হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই।

(সূরা আ'রাফ-৭৩)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً – (سورة النساء-٣٦)

অর্থাৎ- "তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে তোমরা কিছুকে শরীক করো না।"

(সূরা ঃ নিসা-৩৬)

এ দাওয়াত দিয়েছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বুঝা গেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রাসূলগণ সকলেই তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ তথা ইবাদাতের ক্ষেত্রে একত্ববাদী হওয়ার জন্যে মানব জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন। হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার একত্ববাদী বান্দাদের মধ্যে শামিল কর। আমিন !

দ্বিতীয় প্রশ্ন ও উত্তর

ভূমিকা ঃ- সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আজীজ বিন বাজের (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) লিখিত "সঠিক আক্বিদা ও উহার পরিপন্থী বিষয়াবলী" নামক গ্রন্থে বলেছেন, "আল কোরআন ও রাসূলের (সাঃ) সুন্নাতে বর্ণিত শরীয়াতী প্রমাণাদি দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত রয়েছে যে, যাবতীয় কার্যাবলী ও কথাবার্তা কেবল তখনই আল্লাহর নিকট সঠিক বলে স্বীকৃত ও গৃহীত হবে যখন এটা বিশুদ্ধ আক্বিদা অর্থাৎ সঠিক দ্বীনি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হবে। আর যদি আক্বিদা বিশুদ্ধ না হয় তাহলে এর ভিত্তিতে সম্পাদিত যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহ ত'য়ালার নিকট বাতিল বলে গণ্য হবে।"

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে বলেন-

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ – (سورة المائدة–٥)

অর্থাৎ- "আর যে ব্যক্তি ঈমান প্রত্যাখান করবে তার সমস্ত আমল অবশ্যই বিফলে যাবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভুক্ত হবে।"

(সূরা মায়েদা- ৫)

প্রশ্ন ঃ-শিরক কী ? এটা কত প্রকার ও কী কী ? প্রত্যেক প্রকারের হুকুম দৃষ্টান্তসহ বর্ণনা করুন ? আমাদের দেশে প্রচলিত পাঁচটি শিরক কাজের নাম লিখুন।

উত্তর ঃ- অবতরণিকা ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ – (سورة لقمان–١٣)

অর্থাৎ- "নিশ্চয় শিরক বিরাট জুলুম।" (সূরা লুকমান-১৩)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ– (سورة الزمر–٦٥)

অর্থাৎ- "নিশ্চয় যদি তুমি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি হয়ে যাবে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের (জাহান্নামী) অন্তর্ভূক্ত।" (সূরা যুমার- ৬৫)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الشرك بالله (مسلم)

অর্থাৎ- "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের সংবাদ দেব না ? তা হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শিরক করা।" (সহীহ মুসলিম)

তাওহীদের সাথে শিরকের উপমা হচ্ছে- জীবন আর মৃত্যুর, আলো আর আঁধারের, দৃষ্টি আর অন্ধত্বের, পাক আর নাপাকের। শিরক হচ্ছে সকল অপকর্মের ইউনিভার্সিটি, সর্বনাশ ও ধ্বংসের ইবলিসী হাতিয়ার। শিরক এমন এক অপরাধ, সকল আনুগত্যই যার কারণে নিষ্ফল হয়ে যায়। শিরক এমন এক দোষ, কোন গুণই যার সাথে ফলপ্রসূ নয়। শিরক এমন এক পঙ্গুত্ব ও অপমান, কোন উন্নতিই যার সাথে সম্মান এনে দিতে পারে না। এ হচ্ছে এমন এক বিষাক্ত আগাছা যার জন্ম হয় অজ্ঞতার পরিবেশে, যার মূলে পানি সেচ দেয় ধারণা আর রহস্য ঘেরা কল্পনা, (যেমন- কার ভেতর কী আছে বলা যায় না)। এর শেকড় হচ্ছে- প্রবৃত্তিপ্রসূত গতানুগতিক লোকাচার, এর ফল হচ্ছে- জাহান্নামের অনন্ত দাহন যন্ত্রনা।

শিরক কী ?

শিরকের আভিধানিক অর্থ

শিরক শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে-

১. অংশ, অংশীবাদ।
২. সংমিশ্রণ।
৩. মিলানো ও
৪. সমান হওয়া।

উপরোক্ত সবক'টি অর্থের মধ্যে মিশ্রণ এবং মিলানো অর্থ পাওয়া যায়। যেমন- অংশ অর্থে ব্যবহার করলে মিশ্রণ এবং মিলানো অর্থ দুটো এভাবে এসে যায় যে, এক অংশীদার অপর অংশীদারের সাথে সংমিশ্রিত থাকে এবং তার অংশ অপরজনের অংশের সাথে মিলানো থাকে। (সিহাহ্, মিছবাহ)

আল্লামা রাগেব ইস্‌পাহানী তাঁর 'মুফরাদাত' গ্রন্থে বলেন- শিরকের অর্থ হচ্ছে- "দু'স্বত্বাধিকারের মিশ্রণ।" কেউ কেউ বলেন- "কোন বস্তু বা বিষয় দু'বা ততোধিক ব্যক্তির জন্যে সাব্যস্ত হওয়াকে শিরক বলে।"

শিরকের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এতে দু'শরীকের অংশ সমান হওয়া আবশ্যক নয়। বরং শতভাগের এক ভাগের অংশীদার হলেও তাকে অংশীদার বলা হয়। তাই আল্লাহ তায়ালার হকের সামান্যতম অংশ অপরকে দিলেই তা শিরকে পরিণত হবে। এতে আল্লাহর অংশটা যত বড়ই রাখা হোক না কেন।

শিরকের পারিভাষিক অর্থ

ওলামাগণ শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। অর্থের দিক থেকে এগুলো প্রায় এক হলেও ভাষাগতভাবে ভিন্ন।

১. 'সিহাহ্' ও 'মেছবাহ' গ্রন্থকারদ্বয় শিরককে কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২. আল্লামা রাগেব ইস্‌পাহানী বড় শিরকের সংজ্ঞায় বলেন-

هو إثبات شريك لله تعالى অর্থাৎ- 'আল্লাহর সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করা।' পক্ষান্তরে ছোট শিরকের সংজ্ঞায় তিনি বলেন-

هومراعاة غير الله معه فى بعض الأمور অর্থাৎ- 'কোন বিষয়ে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহর প্রতি লক্ষ্য করা।'

৩. আল্লামা রাবি ইবনু হাদী আল মাদখালী (রঃ) বলেন- শিরক হচ্ছে- আল্লাহর এমন কোন সমকক্ষ স্থীর করা যাকে আল্লাহর মতই ডাকা হয়, ভয় করা হয়, তার কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতই তাকে ভালবাসা নিবেদন করা হয়, তার কোন প্রকারের ইবাদাত করা হয়।

৪. ডঃ ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মদ আল-বুরাইকান তাঁর 'আল-মাদখাল' নামক গ্রন্থে বলেন- শিরকের দুটো অর্থ রয়েছে।

প্রথমত ঃ আম বা সাধারণ অর্থ। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা 'রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত, আসমাউস্ সিফাত' এর মধ্যে গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমান মনে করা। এখানে সমান মনে করা অর্থ হল, গায়রুল্লাহকে যে কোন একটা অংশ, চাই তাতে আল্লাহ গায়রুল্লাহর সমান হন কিংবা তাঁর চেয়ে বড় অংশের অধিকারী হন।

প্রসঙ্গত এ সাধারণ ও বিস্তৃত অর্থের ভিত্তিতে শিরক তিন প্রকার হয়ে যায় যথাঃ-

১. রুবুবী শিরক
২. উলুহী শিরক ও
৩. আসমা ও সিফাতে শিরক।

দ্বিতীয়ত ঃ খাছ বা নির্দিষ্ট অর্থ। আর তা হচ্ছে- "আল্লাহ তা'য়ালার সাথে গায়রুল্লাহকে ইবাদাত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা।" এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন-সুন্নাহ ও সালফে সালেহীনের বক্তব্যের মধ্যে শিরকের এ অর্থটিই সচরাচর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। শিরক বলতে সাধারণত তাঁরা ইবাদাতের শিরককেই বুঝান।

শিরক কত প্রকার ও কী কী ?

শিরকের প্রকারভেদ

শিরকের প্রকার বহু বিচিত্র ধরনের এবং এ প্রকারভেদের বেড়াজালে পড়ে অনেক সময় দিশেহারা হতে হয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) তাঁর- "আল-জাওয়াব আল কাফী লিমান সাআলা আন আদ-দাওয়া আশ্ শাফী" নামক গ্রন্থে শিরককে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেছেন। বুঝার সুবিধার্থে আমরা এ দু'প্রকারকে দুটো অনুচ্ছেদে ভাগ করব। তার অধীনেই শিরকের বিস্তারিত প্রকারসমূহ আলোচিত হবে। (ইনশাআল্লাহ)

প্রথম অনুচ্ছেদ

شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله (الجواب الكافي-١٥٢)

অর্থাৎ- এমন শিরক যা মা'বুদের সত্তা, তাঁর নামসমূহ, গুণাবলী ও কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত।

এ অনুচ্ছেদের শিরকসমূহের মধ্যে ছোট শিরক নেই। এগুলো দুটো শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ থাকবে। যার কোনটিই তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হবেনা।

১. الشرك الأكبر সবচেয়ে বড় শিরক।

২. الشرك الكبير সাধারণভাবে বড় শিরক।

এ শিরকগুলো সাধারণত কাফির ও মুশরিকদের মধ্যে সংঘটিত হয়। মুসলিম উম্মাহ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এ শ্রেণীর শিরকে কমই আক্রান্ত হয়। এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

شرك فى عبادة الله ومعاملته (الجواب الكافى-١٥٢)

অর্থাৎ- আল্লাহর ইবাদাত ও তার সাথে করণীয় আচরণে শিরক।

وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر و أصغر (الجواب الكافى-١٥٥)

অর্থাৎ-এ শ্রেণীর শিরক মার্জনীয়, অমার্জনীয় এবং বড় শিরক ও ছোট শিরকে বিভক্ত।

এ শ্রেণীর শিরক মহাপাপ হলেও প্রথম অনুচ্ছেদের শিরকের তুলনায় হালকা। কেননা এ শ্রেণীর শিরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'তে বিশ্বাসীরা আক্রান্ত হয়ে থাকে। যেমন- আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) বলেন-

وأما الشرك فى العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا فإنه يصدرممن يعتقد أنه لا إله إلا الله

এবার আমরা হুকুম ও দৃষ্টান্তসহ উভয় অনুচ্ছেদের শিরকসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করব। (ইনশাআল্লাহ) (وبالله التو فيق)

প্রথম অনুচ্ছেদের বিস্তারিত আলোচনা

الشرك فى ذات الله وأسمائه و صفاته وأفعاله

অর্থাৎ- আল্লাহর সত্তা; নামসমূহ, গুণরাজি ও কার্যাবলীতে শিরক। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য শিরক।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) বলেন-এ শিরক দু'প্রকার।

১. শিরক আত্ তা'তীল বা আল্লাহকে নিষ্ক্রয় ও গুণ শূণ্য করার শিরক।

প্রকৃতপক্ষে এটা নাস্তিকতার নামান্তর। যেমন- "ফেরআউন আল্লাহকে নিষ্ক্রয় বা অস্তিত্বহীন মনে করে নিজেই লালন-পালনকারী বলে দাবি করেছিল।

শিরক আত্ তাতীল আবার তিন প্রকার। যথাঃ-

(ক) সৃষ্টিকে স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় করা। যেমন- ফেরআউনের উপরোক্ত শিরক।

(খ) স্রষ্টাকে তাঁর সুন্দর নামসমূহ, গুণরাজি ও কার্যাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে নিষ্ক্রিয় ও অস্তিত্বহীনের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়া। যেমন- জাহমিয়্যাহ ও কারামেতাদের শিরক। যারা আল্লাহর নামসমূহ, গুণরাজি ও কার্যাবলীকে অস্বীকার করে বলতে চেয়েছে যে- ليس فى السماء رب يعبد অর্থাৎ- আকাশে এমন কোন মা'বুদ নেই যার ইবাদাত করা যেতে পারে।

(গ) আল্লাহর সাথে করণীয় আচরণ ও একত্ববাদকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও অস্বীকার করা। যেমন- ওয়াহ্দাতুল ওয়াজুদ তথা সৃষ্টি ও স্রষ্টার এক দেহে লীন হওয়ার বিশ্বাস। যা হিন্দুদের বেদ-পুরাণ ও ভ্রান্ত সুফীবাদে স্বীকৃত। একেই তারা তাওহীদ বা একত্ববাদ মনে করত এবং শরীয়তে স্বীকৃত তাওহীদকে অস্বীকার করত।

আর যেমন গ্রীক দার্শনিক ও তাদের অনুসারীদের শিরক। যারা বিশ্বাস করত পৃথিবী অবিনশ্বর এবং পৃথিবীর আত্মা ও নফসই সকল কর্ম করে থাকে। সুফীবাদীরা রূহানী ফায়েজ ইত্যাদি পরিভাষা এদের থেকেই শিখেছে।

২. আল্লাহর সাথে কাউকে স্বতন্ত্র মা'বুদ সাব্যস্ত করে নেয়া। যেমনঃ-

✪ খৃস্টান জাতি কর্তৃক ঈসা আলাইহিস সালাম ও মারইয়াম আলাইহিস সালামকে ইলাহ সাব্যস্ত করা।

✪ অগ্নি পূজারীদের কর্তৃক আলো ও আঁধারকে যথাক্রমে কল্যাণ ও অকল্যাণের স্রষ্টা মনে করা।

✪ সূর্য-চন্দ্র পূজারীদের শিরক- যারা এগুলোকে বিশ্বের ব্যবস্থাপক মনে করে।

✪ নমরূদের শিরক- যে নিজেকে জীবন ও মৃত্যুদাতা হওয়ার দাবি করে ইলাহ্ সাব্যস্ত করেছিল।

আল্লাম আবুল বাকা আল হানাফী (রঃ) তাঁর 'কুল্লিয়্যাত'-এর মধ্যে প্রথম অনুচ্ছেদের শিরককেই আবার ছয় ভাগে ভাগ করেছেন।

১. شرك الإستقلال (শিরকুল ইসতিক্বলাল) অর্থাৎ- দু'জন ভিন্ন ভিন্ন বা স্বতন্ত্র মালিকানাসম্পন্ন শরীক সাব্যস্ত করা। যেমন- অগ্নিপূজারীদের শিরক। যারা আলোকে কল্যাণের স্রষ্টা ও অন্ধকারকে অকল্যাণের স্রষ্টা মনে করে।

২. شرك التبعيض (শিরক আত্ তাবয়ীদ) অর্থাৎ- একাধিক মা'বুদের সমন্বয়ে এক মা'বুদ হওয়ার বিশ্বাস করা। যেমনঃ-

✪ খৃস্টনদের ত্রিত্ববাদ তথা আল্লাহ, ঈসা আলাইহিস সালাম ও মারইয়াম আলাইহাস সালাম দ্বারা সমন্বিত মা'বুদের বিশ্বাস।

✪ যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর সত্তার অংশ বা তাঁর রূহানী সত্তা মনে করে তারাও উক্ত শিরকে আক্রান্ত।

৩. شرك التقريب (শিরক আত্ তাক্বরীব) অর্থাৎ- এ আশায় গায়রুল্লাহর ইবাদাত করা যে তারা আল্লাহর নৈকট্য পাইয়ে দেবে। যেমন- প্রাচীন জাহেলী যুগের মূর্তি পূজারীদের শিরক। পোপ পূজারী খৃস্টান, পুরোহিত পূজারী হিন্দু ও পীর পূজারী মুসলমান এ শিরকের আওতায় পড়ে যায়।

৪. شرك التقليد (শিরক আত্ তাক্বলীদ) অর্থাৎ- অন্যের অন্ধ অনুসরণে গায়রুল্লাহর ইবাদাত করা। যেমন- পূর্ববর্তী জাহেলী মুশরিকদের অন্ধ অনুকরণে পরবর্তী জাহেলীদের শিরক, যারা পিতৃপুরুষদের দোহাই দিয়ে শিরকে লিপ্ত হত। পিতৃপুরুষরা যা পূজা করত তারাও তা'ই পূজা করত।

৫. شرك الأسباب (শিরকুল আসবাব) অর্থাৎ- প্রকৃতি পূজারী বা পৃথিবীতে সংঘটিত ঘটনা-দুর্ঘটনাকে প্রকৃতির ক্রিয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে বিশ্বাস করা। যেমনঃ- জড়বাদী ও প্রকৃতিবাদীদের শিরক, যারা যে কোন কল্যাণকে প্রকৃতির দান ও অকল্যণকে প্রকৃতির বিরূপ ক্রিয়া বলে বিশ্বাস করে।

৬. شرك الأغراض (শিরকুল আগরাদ) অর্থাৎ- সম্পূর্ণ গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা। যেমনঃ- প্রকৃত মুনাফিকের নামায যা কেবল মানুষকে দেখাবার জন্যেই সে পড়ে থাকে।

শায়েখ মুবারক ইবনু মুহাম্মদ মাইলি সূরা সাবা'র ২২ ও ২৩ নং আয়াতের ভিত্তিতে উপরোক্ত শিরককে চারভাগে ভাগ করেছেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এ প্রকারগুলো ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম ও আল্লামা আবুল বাকার বর্ণিত প্রকারসমূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল। পার্থক্য শুধু ভাষা ও বর্ণনায়। হুকুম ও দৃষ্টান্তে এগুলো পূর্বের প্রকারসমূহের মতই। তাই এগুলোর পৃথকভাবে কোন দৃষ্টান্ত আমরা পেশ করব না। শুধু প্রকার সমূহ উপস্থাপন করছি।

১. شرك الإحتياز (শিরক আল ইহতিয়ায) অর্থাৎ- স্বতন্ত্র মালিকানা স্বত্বাধিকারের শিরক। আসমান জমীনে অণু-পরিমাণ বস্তুর মধ্যেও আল্লাহ ভিন্ন কারো মালিকানা নেই।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঃ

✪ অণুর ভিত্তি ------------------------ পরমাণু।
✪ পরমাণুর ভিত্তি --------------------- ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন।
✪ ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এর ভিত্তি -- কোয়ার্ক।
✪ কোয়ার্কের ভিত্তি -------------------- ফোটন বা আলোর কণা।
✪ ফোটনের ভিত্তি --------------------- ইনফরমেশন বা তথ্যকণা।
✪ ইনফরমেশনের ভিত্তি ------------ কুন ফাইয়াকুন। (كن فيكون)

অতএব, এ মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল বিস্তীর্ণ আকাশ পর্যন্ত সবকিছুই 'কুন' বা 'হও' নির্দেশের দ্বারা সৃষ্টি। যে নির্দেশটি দিয়েছেন একমাত্র আল্লাহ। তাই এ মহাবিশ্বে আল্লাহ ছাড়া কারো স্বত্বাধিকারের দাবি সম্পূর্ণ অসত্য ও অবাস্তব। (আল কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ, মহাকাশ পর্ব- ২)

২. شرك الشياع (শিরক আশ-শিয়া) অর্থাৎ- যৌথ মালিকানার শিরক। আল্লাহর সাথে এ ধরনের শরীকানাও অসম্ভব।

৩. شرك الإعانة (শিরক আল এয়ানাহ) অর্থাৎ- সাহায্য-সহযোগিতার শিরক। আল্লাহর কোন সহযোগী নেই। তিনি স্বয়ম্ভু, সর্বশক্তিমান, অমুখাপেক্ষী।

৪. شرك الشفاعة (শিরক আশ-শাফায়াহ) অর্থাৎ- শাফায়াতের শিরক আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নির্দেশ ব্যতীত কেউ নিজ ক্ষমতা বা মর্যাদা বলে

কারো জন্যে সুপারিশ করতেই পারবে না। কালামেপাকে ইরশাদ হচ্ছে-

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ – وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ –(سورة السبا–٢٢–٢٣)

অর্থাৎ- "বল ! (হে মুশরিক সম্প্রদায়) তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বুদ মনে করছ, তারা আকাশ ও পৃথিবীর অনু পরমানুরও মালিক নয়। এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেহ তাঁর সহযোগীও নয়। যার জন্য অনুমতি দেয়া হবে সে ব্যতীত আর কারো জন্য শাফায়াত তাঁর কাছে কোন উপকার দেবে না।"

(সূরা সাবা- ২২-২৩)

ডঃ আলী ইবনু নুফাই আল আলাইয়ানী তাঁর 'আত তামায়েম' গ্রন্থে বলেন- মুশরিকরা যখন কারো নিকট থেকে কোন প্রকার উপকার পাওয়ার আশা করে তখনই কেবল সে তাকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করে নেয়। আর বলা বাহুল্য যে, উপকার একমাত্র তার কাছ থেকেই পাওয়া যায় যার মধ্যে এ চারটি গুণের একটি হলেও বিদ্যমান আছে।

গুণগুলো হলো ঃ

১. ইবাদাতকারী তার কাছে যা আশা করে তার স্বতন্ত্র মালিক হওয়া।
২. স্বতন্ত্র মালিক না হয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যে কোনো ভাবে মালিক হওয়া।
৩. অংশীদারও না হলে সে জিনিসের ব্যাপারে মালিকের সাহায্যকারী হওয়া এবং
৪. সাহায্যকারীও না হলে অন্ততপক্ষে মালিকের কাছে কারো জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখা।

আল্লাহ তা'য়ালা উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে শিরকের এ চারটি স্তরকেই ধারাবাহিকভাবে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করেছেন যে, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও রাজত্বে অন্য কারো মালিকানা, অংশীদারিত্ব, সাহায্য-সহায়তা এবং তাঁর কাছে সুপারিশের ক্ষমতা বিন্দুমাত্রও নেই। তবে আল্লাহ নবী-রাসূল ও পুণ্যবানদের যে সুপারিশ সাব্যস্ত করেছেন সেটা তাঁর অনুমতিক্রমে হয় বলে তাতে মুশরিক ও অংশীবাদীর জন্য কোন অংশ নেই। কারণ নবী-রাসূল ও পূণ্যবানদের সুপারিশ তাওহীদবাদী বান্দা ছাড়া আর কেউই পাবে না।-

উপরোক্ত শিরকসমূহের হুকুম

এসব শিরকের প্রত্যেকটিই বড় শিরক। এগুলোতে লিপ্ত ব্যক্তিরা ইসলাম বহির্ভূত কর্মে লিপ্ত। তাওবা ও তাওহীদ ফিরে আসা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে এরা চির জাহান্নামী হবে। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَار

(سورة المائدة-٧٢)

অর্থাৎ- "নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম আর অত্যাচারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারীই থাকবে না।"

(সূরা মায়েদা- ৭২)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বিস্তারিত আলোচনা

যে সব শিরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তে বিশ্বাসীরা আক্রান্ত হয়।

شرك فى عبادة الله ومعاملته

অর্থাৎ- "আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর সাথে করণীয় আচার-আচরণে শিরক।

ডঃ আলী ইবনু নুফাই আল আলইয়ানী তাঁর 'আত-তামায়েম' গ্রন্থে বলেন- মূলত শিরক হচ্ছে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া বা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করা। অর্থাৎ স্রষ্টা হওয়ার জন্য যে সব গুণাবলী প্রয়োজন সেগুলোর ক্ষেত্রে কেউ সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা করলে সে মুশরিক বা অংশীবাদী হয়ে যাবে। ক্ষতি করা, উপকার করা, দান করা ও দান না করার একক অধিকারী হওয়া ইলাহের বৈশিষ্ট্য তথা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আর এসব গুণাবলীর একক অধিকারী হওয়ার কারণে প্রার্থনা করা, ভয় করা, কোন কিছুর আশা করা এবং ভরসা করা কেবল তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত হতে পারে।

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এসব গুণকে মাখলুক বা সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করে তবে সে যেন সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে শরীক করল। আর চূড়ান্ত দুর্বল, নিঃস্ব কোন কিছুকে ক্ষমতাবান, স্বাবলম্বী সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার সাথে তুলনা খুবই নিকৃষ্টমানের তুলনা। যে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে নিজের শ্রেষ্টত্ব, বড়ত্ব জাহির করে এবং তার প্রশংসা করার জন্য, তাকে সম্মান করার জন্য, তার কাছে অবনত হওয়া ও আশা করার জন্য মানুষকে আহবান করে, তবে ঐ ভয় করা, আশা করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষের অন্তরকে তার সাথে

সম্পৃক্ত করার কারণে নিশ্চয়ই সে আল্লাহর একত্ববাদ ও প্রভুত্বের ক্ষেত্রে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। শিরক হল আল্লাহর প্রতি নিকৃষ্ট একটি ধারণা।

সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন মাধ্যম দাঁড় করানো তাঁর প্রভুত্ব, রূবুবিয়্যাত ও একত্ববাদের প্রতি চরম আঘাত এবং তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করার শামিল। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এ ধরণের ধারণা করাকে কিছুতেই অনুমোদন করেন না। আর মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও নিষ্কলুষ প্রকৃতিও এ ধরনের ধারণাকে পরিত্যাগ করে এবং সুস্থ প্রকৃতি ও উন্নত স্বভাবের নিকট এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় বলে বিবেচিত।

ডঃ ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মদ আল বুরাইকান তাঁর 'আল-মাদখাল' নামক গ্রন্থে বলেন- শিরক (ইবাদাতে ক্ষেত্রে) তিন প্রকার।

১.আশ-শিরক আল আকবার বা বড় শিরক। এর অর্থ হল- আল্লাহর কোন সমকক্ষ স্থির করে আল্লাহর মতই তার ইবাদাত ও আনুগত্য করা।

২. আশ-শিরক আল আসগার বা ছোট শিরক। আর তা হচ্ছে আমলের কাঠামো ও মুখের কথায় গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ সব্যস্ত করা। অথবা কথায় ও কাজে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহর মনতুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৩. আশ-শিরক আল খাফী বা গোপন শিরক। আর তা হচ্ছে- হৃদয়ের এমন গোপন ইচ্ছা ও মুখের এমন অসতর্কমূলক কথা যাতে আল্লাহ ও গায়রুল্লাহ সমান হয়ে যায়।

(الشرك ومظاهره)

উপরোক্ত তিন প্রকার আবার অনেক উপ প্রকারে বিভক্ত। এবার আমরা দৃষ্টান্তসহ এগুলো বর্ণনা করব। অতঃপর এগুলোর হুকুম বর্ণনার প্রয়াস পাবো। (ইনশাআল্লাহ)

আশ-শিরক আল আকবার (ফিল ইবাদাত) এর প্রকারসমূহ

১. দোয়ার ক্ষেত্রে শিরক তথা আল্লাহকে ডাকার মত গায়রুল্লাহকে ডাকা। সে ডাক কোন প্রাপ্তি বা মুক্তির জন্যে হোক কিংবা শুধু ইবাদাত বা বিনয় প্রকাশার্থে হোক। এ দোয়া বা ডাক তিনটি শর্তে শিরকে পরিণত হবে।

(ক) রূপক কোন অর্থ উদ্দেশ্য না করে বাস্তব অর্থে ডাকলে।

(খ) প্রার্থিত বিষয়টি আল্লাহ ছাড়া আর কারো অধিকারে না থাকলে।

(গ) প্রার্থনাকারী প্রার্থিত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত না থাকলে অথবা মৃত হলে। যেমন ঃ-

✪ জীবিত পীর, খাজা, গাউস-কুতুবের কাছে সন্তান, রোগ নিরাময়, ব্যবসায়ে উন্নতি, বিপদ হতে পরিত্রাণ ও পারলৌকিক সুপারিশ ও মুক্তির প্রার্থনা করা।

✪ কোন মৃত, কবরস্থ, কিংবা অনুপস্থিত পীর-দরবেশের নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করা। যদিও সেটি এমন বস্তু হয় যা মানুষ দিতে পারে এরূপ গায়েবানা দোয়া তো একমাত্র আল্লাহরই হক। যেমন ঃ-

يا عبد القادر شيئا لله

অর্থাৎ- 'হে আব্দুল কাদের ! আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান কর।'

✪ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মাঝিদের অনেকেই নদীতে ঝড়ে আক্রান্ত হলে উদ্ধারের আশায় বদর নামক পীরকে 'বদর বদর' বলে ডাকে। বাংলা সাহিত্যের জনৈক কবির কবিতার একটি পংক্তিতে রোগ নিরাময়ের আশায় রুগ্ন শিশুর মায়ের একটি প্রার্থনা এভাবে ফুটে উঠেছে-

"ভাল কর আল্লাহ-রাসূল ভাল কর পীর"

এই পংতিতে আল্লাহর সাথে রাসূল আর পীরকে ডেকে বড় শিরক করা হয়েছে।

✪ বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ উর্দু কবিতায় বলা হয়েছে-

محمد یا رسول الله شفاعت کیجی لله

অর্থাৎ- "হে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ! আল্লাহর ওয়াস্তে শাফায়াত করুন।"
উক্ত অঞ্চলে আরেকটি কবিতায় বলা হয়েছে-

يا رسول الكبرياء! احفظ عن كل البلاء

অর্থাৎ- "হে বড়ত্বের অধিকারী রাসূল (সাঃ) সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।"
উপরোক্ত দুটো কবিতায় দোয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট দু'টো শিরকে আকবার রয়েছে।

(ক) পরলোকগত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গায়েবানা ভাবে ডাকা।

(খ) তাঁর কাছে শাফায়াত চাওয়া ও বিপদ থেকে পরিত্রাণ কামনা করা, যা একমাত্র আল্লাহর হক। অথচ তা এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চাওয়া হয়েছে।

✪ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী এর 'মুনাজাতে মাক্ববুল' এর শেষ পাতায় একটি কবিতার সূচনা এভাবে করা হয়েছে- رسول الله جئتك مستعيذا অর্থাৎ- "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার কাছে পানাহ বা আশ্রয়প্রার্থী হয়ে আমি এসেছি।" পুরো কবিতাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা, সাহায্য কামনা ও ফরিয়াদ প্রার্থনায় ভরপুর। অথচ এসব কিছুই শুধুমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার অধিকার যা গায়রুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা শিরক।

২. নিয়্যত, ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে শিরক। অর্থাৎ নিজের আমল দ্বারা সংক্ষেপে ও সবিস্তারে গায়রুল্লাহকে উদ্দেশ্য করা। এ শিরক আক্বিদাহ বিশ্বাসের মাঝে বিরাজ করে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম বলেন-

وأما الشرك فى الإرادات والنيات فذالك البحر الذى لا ساحل له

(الجواب الكاف-١٥٩)

অর্থাৎ- "ইচ্ছা ও ইরাদার এ শিরক হচ্ছে এমন এক সাগর যার কোন কূল-কিনারা নেই।" অনেক অল্প মানুষই এ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে থাকে। যে ব্যক্তি নিজ আমলের দ্বারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নৈকট্য কামনা করবে, তার কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করবে অথবা শুধু পার্থিব কল্যাণের উদ্দেশ্যেই আমল করবে সে ব্যক্তি ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে শিরকে লিপ্ত হবে। যেমন-

✪ মক্কার পরকাল অবিশ্বাসী মুশরিক সম্প্রদায়, যারা শুধু পার্থিব কল্যাণের উদ্দেশ্যেই হজ্ব, উমরা, বায়তুল্লাহর খেদমাত আঞ্জাম দিত।

✪ সমাজতন্ত্রবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, পুঁজিবাদী ও জড়বাদী নাস্তিক সম্প্রদায় এদের জীবনের মূল লক্ষ্যেই হলো পার্থিব ভোগ-বিলাস, যাদের সবচেয়ে বড় শ্লোগান হলো "খাও দাও ফূর্তি কর।" "দুনিয়া তোমারী হ্যায়, দুনিয়া কা মজা লে লো।" এরা সকলেই উপরোক্ত শিরকে লিপ্ত রয়েছে।

অতএব আল্লাহকে বাদ দিয়ে শুধু ইহকালীন জীবনের লক্ষ্যেই কোন কাজ করলে তা শিরকে আকবার হয়ে যাবে। যার পরিণাম চির জাহান্নাম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ - أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - (سورة هود-١٥-١٦)

অর্থাৎ- " যে পার্থিব জীবন এবং তার চাকচিক্য কামনা করবে, পৃথিবীতে তাকে তার কর্মের ফল পরিপূর্ণভাবে দান করব এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। তাদের জন্য পরকালে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। পৃথিবীতে তারা যা করবে সবই বিনষ্ট, ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং তারা যা আমল করবে সবই হবে নিরর্থক।"

(সূরা হুদ- ১৫ ও ১৬)

৩. শিরক আত্ তা'আ। অর্থাৎ হুকুম এবং বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ বিধান প্রণয়ন বা হুকুম প্রদান করা আল্লাহর হক বা অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ - (سورة يوسف-٤٠)

অর্থাৎ- "হুকুম তো একমাত্র আল্লাহর জন্যেই।" (সূরা ইউসুফ-৪০) যেমন-

✪ কুরআন-সুন্নাহর আইনের বিরোধী মানব রচিত সংবিধানের আনুগত্য করা। যা সুস্পষ্ট শিরকে আকবার। যে ব্যক্তি মানব রচিত আইনের কাছে বিচার চায় সে মুশরিক ও কাফের। যার কাছে বিচার চাওয়া হল সে তার মা'বুদ ও তাগুত।

✪ সুফীবাদীদের শিরকযুক্ত তরীক্বাহসমূহের অনুসরণ করা। যেগুলোতে যিকিরের সময় মুরীদের ক্বলব পীরের ক্বলবের দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হওয়ার এবং ইবাদাতের সময় تصور الشيخ বা পীরের কল্পনা করার বিধান রয়েছে। এবং কুরআন ও সুন্নাহর দলিল-প্রমাণ ব্যতীত পীরের সমস্ত কথা মেনে নেয়াকে অপরিহার্য করা হয়েছে। এ সবগুলোই শিরকে আকবারের অন্তর্ভুক্ত। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفاً - (سورة الانعام-٧٩)

অর্থাৎ- "আমি মুতাওয়াজ্জিহ করছি আমার (হৃদয়) ও চেহারাকে ঐ আল্লাহর প্রতি যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃজন করেছেন।"

(সূরা: আনআম-৭৯)

রাসূল (সাঃ) বলেন-

الأحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (بخاری)

অর্থাৎ- "ইহসান হচ্ছে এই যে তুমি আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে না দেখ তবে তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।" (বুখারী ও মুসলিম) অথচ সুফীবাদে ইবাদাতের সময় পীরকে কল্পনা করে ইবাদাত করতে বলা হয়। (নাউযুবিল্লাহ) কালামে পাকে আরো ইরশাদ হচ্ছে-

لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ – (سورة الانبياء-٢٣)

অর্থাৎ- "তিনি (আল্লাহ) নিজ কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। আর তারা সকলেই জিজ্ঞাসিত হবে।"

(সূরা আল-আম্বিয়া- ২৩)

অথচ সুফীবাদে পীরকে আল্লাহর এ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে।

আরো একটি উদাহরণ- সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ইহুদী-খ্রিস্টান ও পৌত্তলিকদের অনুকরণ করা। আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গন যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কপালে তিলক ও সিঁদুর পড়া, রাখি বন্ধন, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, শঙ্খ ধ্বনি দেয়া, আশ্রমে গিয়ে 'ওম্ শান্তি' 'ওম্ শান্তি' ও 'ওম্ শুদ্ধতম', ভক্তি ভরে গীতা শ্রবণ ইত্যাকার সবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। ইরশাদ হচ্ছে-

وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ – (سورة الانعام-١٢١)

অর্থাৎ- "আর তোমরা যদি তাদের (শয়তানের বন্ধুদের) অনুকরণ কর তবে অবশ্যই তোমরা মুশরিক।" (সূরা আল-আনআম- ১২১)

৪. শিরক আল-মুহাব্বাহ। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে এমনভাবে ভালবাসা যে বান্দাহ গায়রুল্লাহর সামনে বিনীত বিগলিত ও তার দাস হয়ে যায়, চাই সে ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসার সমান হোক বা কম-বেশি হোক। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ – (سورة البقرة-١٦٥)

অর্থাৎ- "মানুষের মধ্যে এমন কতক সম্প্রদায় রয়েছে যারা আল্লাহর এমন সমকক্ষ সাব্যস্ত করে যাদেরকে তারা আল্লাহর মতো ভালবাসে।"

(সূরা বাক্বারা- ১৬৫)

বস্তুতপক্ষে সৃষ্টির সকল ইতিবাচক কাজের মূল প্রেরণা আসে ভালবাসা থেকে আর না-বাচক কাজের প্রেরণা আসে ঘৃণা বা বৈরিতা থেকে। এ জন্য

ভালবাসাই মূলত তাওহীদ আল-উলুহিয়্যার ইন্ডিকেটর বা নির্দেশক। এ জন্যই ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) উলুহী তাওহীদকে ভালবাসার তাওহীদ নাম দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ মানে তো এমন বান্দাহ যে পরম ভালবাসা ও চূড়ান্ত বিনয়ে আল্লাহর জন্য বিগলিত বশংবদ ও নিবেদিত হয়েছে। তাইমুল্লাহ শব্দটিও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। শিরক আল মুহাব্বাহ এর উদাহরণ। যেমনঃ-

✪ মূর্তিপূজারী সম্প্রদায় কর্তৃক তাদের মূর্তিসমূহ- লাত, মানাত, উজ্জা, ওয়াদ, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর, সুয়া, শিব, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, গণেশ, দুর্গা ইত্যাদির ভালবাসা।

✪ ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় কর্তৃক তাদের দেবতাসমূহ- চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনিগ্রহ সহ নানা নক্ষত্র-জ্যোতিষ্কের ভালবাসা।

✪ ইহুদী-খৃস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক উযাইর (আঃ) ও ঈসা (আঃ) এবং তাদের আহবার ও রোহবান তথা আলেম ও ইবাদাতকারী সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর সমান ভালবাসা।

✪ কিছু মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক গাউস, কুতুব, পীর-ফকীর, খাজা, দরগাহ-মাজার ইত্যাদির প্রতি শিরকী ভালবাসা।

✪ অপর একটি মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক (ডঃ ইকবালের ভাষায়) আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির প্রতি অন্ধ ভালবাসা।

✪ আমাদের তরুণ-তরুণী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কর্তৃক গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকা, নাট্যকার, শিল্পী, চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রতি যে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা তাও এ শিরকী ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত। সালমান শাহের মত একজন চরিত্রহীন নায়কের জন্য বাংলাদেশের বারজন তরুণীর আত্মহত্যা এর প্রকৃষ্ট প্রামাণ নয় কি ?

✪ পার্থিব জীবনের ধন, বিত্ত-বৈভব, ভোগ-বিলাসের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা যা আল্লাহ ও পরকালকে সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয়। তাও এ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم (الصحيح للبخارى كتاب الجهاد)

অর্থাৎ- "ধ্বংস হোক স্বর্ণমুদ্রার বান্দাহ, ধ্বংস হোক রৌপ্য-মুদ্রার দাস।"

(বুখারী, কিতাবুল জিহাদ অধ্যায়-৭০)

৫. ভয়ের ক্ষেত্রে শিরক। অর্থাৎ গায়রুল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদে আক্রান্ত হওয়ার এমন চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ ভয় যা কেবল আল্লাহর জন্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা এ ধরণের ভয় আল্লাহর প্রতি পোষণ করা ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত ।ইরশাদ হচ্ছে-

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي –(سورة البقرة–١٥٠)

অর্থাৎ- "তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর।"

(সূরা বাক্বারা-১৫০)

ভয় তিন প্রকার। যথা ঃ-

(ক) বিশ্বাসগত - গোপন ভয়। যেমন ঃ- মূর্তি, মাজার, দরগাহ, গাউস, কুতুব ইত্যাদিকে মনে মনে ভয় করা। এ ধরনের ভয় শিরকে আকবার।

(খ) কাজের ক্ষেত্রে ভয়। মানুষকে ভয় করে কোন ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয়া কিংবা কোন হারাম কাজ অনুষ্ঠিত করা। এ ধরনের ভয় ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) স্বভাবজাত ভয়। যেমন- বাঘ, সিংহ, সাপ, সন্ত্রাসী, চোর-ডাকাত ইত্যাদিকে ভয় করা। এ ধরনের ভয় শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুসা আলাইহিস সালাম লাঠিকে অজগর হতে দেখে ভয়ে পালাতে শুরু করলেন এবং পেছনে ফিরেও দেখলেন না। বুঝা গেল এ ধরনের ভয় শিরকের পর্যায়ে পড়ে না।

৬. তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে শিরক। তাওয়াক্কুল এর অর্থ হচ্ছে, সকল বিষয়কে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা, উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরই উপর নির্ভর করা। বাহ্যিক উপায় উপকরণ গ্রহন করে প্রতিদানের আশাটুকু তাঁর কাছেই করা। এ অর্থে তাওয়াক্কুল একটি পরিপূর্ণ ইবাদাত। তাই গায়রুল্লাহর উপর এ তাওয়াক্কুল পোষণ করলে তা শিরকে আকবারে পরিণত হবে।

ইরশাদ হচ্ছে-

وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ– (سورة المائدة–٢٣)

অর্থাৎ- "এবং আল্লাহর উপরই নির্ভর কর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।"

(সূরা মায়েদা-২৩)

তাওয়াক্কুল তিন প্রকার । যথাঃ-

(ক) শিরকী তাওয়াক্কুল। কল্যাণ ও অকল্যাণ বিষয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আন্তরিকভাবে গায়রুল্লাহর উপর নির্ভর করা। এটিও আবার দু'প্রকার । যেমন-

(১) যে বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত কারো ক্ষমতা নেই সে বিষয়ে গায়রুল্লাহর উপর আন্তরিক নির্ভরশীলতা। এটি শিরকে আকবার। যেমন- রোগ নিরাময়, জীবিকা দান, সন্তান দেয়া ও বিপদে পরিত্রাণ দেয়ার বিষয়ে গায়রুল্লাহর উপর নির্ভর ও ভরসা করা।

(২) যে উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন তা অর্জন বা দূরীকরণে জীবিত সক্ষম মানুষদের উপর নির্ভর করা। এটি শিরকে আছগার বা ছোট শিরক। যেমন- চাকরি লাভ, মামলায় জয়লাভ, পরীক্ষায় পাশ ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন আত্মীয় কর্মকর্তার উপর নির্ভরশীলতা।

(খ) পার্থিব বিষয় পরিচালনায় পরনির্ভরশীলতা। যেমন- পার্থিব বা ইসলামী কোন কাজ সম্পাদনে কোন ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ করা জায়েজ। বদলী হজ্জ, ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ ইত্যাদি এ প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। এর মধ্যে কোন শিরক নেই।

(গ) তাওহীদী তাওয়াক্কুল যা প্রথমেই আমরা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ সর্ববিষয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করা। উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে ফল লাভের জন্যে তাঁরই উপর নির্ভর করা।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক আল-আছগারের প্রকার ভেদ

শিরকে আছগারকে নিম্নোক্ত প্রকার সমূহে সীমাবদ্ধ করা যায়।

১. কথাগত ছোট শিরক। যা মুখের কথার দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন ঃ- গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা, আপনি চাইলে আর আল্লাহ চাইলে এ কাজটি হবে, আব্দুন্নবী, আব্দুর রাসূল, পীর বক্শ, নবী বক্শ, আমি আল্লাহ এবং আপনার উপর ভরসা করছি, আমি আল্লাহ আর আপনার হেফাজতে রয়েছি, আল্লাহ আর আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, এটি আল্লাহ আর আপনার দান, আমি আল্লাহ আর আপনার আশা করছি, কুকুরটি না হলে আজ রাতে ঘরে চোর ঢুকতো, মাঝি বড় দক্ষ ছিল তাই আজ জীবন রক্ষা

পেল, ড্রাইভারের দক্ষতায় বাসটি রক্ষা পেল, যেমন সার দিয়েছি তেমন ধান হয়েছে ইত্যাদি।

সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- "একদা এক ব্যক্তি নবী (সাঃ) কে বলল- আল্লাহ যা চেয়েছেন আর আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে), রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করলে ? বল ! এক আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে।" (নাসাঈ, হাদীসটি বিশুদ্ধ)

উপরোক্ত কথাগুলো এভাবে বললে শিরক হবে না। যেমন- আমি আল্লাহ অতঃপর আপনার উপর ভরসা করছি, আমার জন্যে আল্লাহ অতঃপর আপনি ছাড়া কেহ নেই, কুকুরটির উছিলায় আজ রাত আল্লাহ চোর থেকে বাঁচিয়েছেন, যেমন সার দিয়েছি আল্লাহ তেমন ফসল দিয়েছেন ইত্যাদি।

২. কার্যগত ছোট শিরক। অর্থাৎ এমন ছোট শিরক যা কর্মের দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন- যাত্রাকালে ঘরের দুয়ারে ভিখারী দেখে তাকে কুলক্ষণ মনে করা, কাক মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়াকে কোন অকল্যাণের পূর্বাভাস মনে করা, হুতুম পেঁচার ডাককে বিপদ বা মৃত্যুর দুঃসংবাদ মনে করা, ভাগ্য জানার উদ্দেশ্যে গণকের কাছে যাওয়া, টিয়া পাখির দ্বারা চিঠি তুলিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা, চোর ধরার জন্য বাটি, বাঁশ ও লাঠি চালান দেয়া, হারানো বস্তুর সন্ধান লাভে মাটিতে রেখা অংকন, আয়না ও তৈল পড়াতে বিশ্বাস করা, চোর শনাক্ত করানোর জন্য রুটি পড়া খাওয়ানো, হারানো বস্তুর সন্ধান লাভের আশায় পীর-ফকীর, দরবেশ, জ্বিন ও খনারের কাছে যাওয়া- এ ধরনের আরো অন্যান্য প্রচলিত কার্যাবলী শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (সাঃ) বলেন- "যে কুলক্ষণ গ্রহন করল সে শিরক করল।" তিনি আরো বলেন- যে গণকের কাছে গিয়ে তার কথায় বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফর করল।" (আহমাদ, মুসলিম)

উল্লেখ্য যে, যে সকল পীর-ফকীর, দরবেশ, জ্বিন, খনার কোন গায়েবী সন্ধান দিতে পারে বলে দাবি করে এরা সকলেই গণক এবং শয়তানের দোসর। শয়তান আকাশ থেকে কোন একটি সত্য সংবাদ চুরি করে এদেরকে বলে দেয়, সেই একটি সত্য সংবাদের সুবাদে ৯৯টি মিথ্যা সংবাদ তাদেরকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়।

৩. হৃদয়গত শিরক। যেমন- লৌকিকতা, সুনাম ও যশ লাভের আশা, কোন আমল করে তার দ্বারা শুধু দুনিয়া কামনা করা। যথা ঃ-

✪ নির্বাচন ঘনিয়ে আসলে সালাত, ওমরাহ, তাসবীহ, হিযাব, মাথায় স্কার্ফ, নয়নাশ্রু বিসর্জন, বেশি বেশি সালাম প্রদান, দোয়া প্রার্থনা, ধর্মীয় পোশাক পড়া ইত্যাদি।

✪ বুজুর্গী প্রকাশের উদ্দেশ্যে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল ভঙ্গিমায় চলা, পালকিতে ভ্রমণ করা, লম্বা তাসবীহ সারা দিন হাতে রাখা, তালিওয়ালা ও ছেঁড়া-ফাড়া পোশাক পরিধান করা।

✪ ক্রেতার কাছে বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার জন্যে দোকানে বসে উচ্চস্বরে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি ঘন ঘন পাঠ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

من صلى يرائى فقد أشرك ومن صام يرائى فقد أشرك ومن تصدَّق يرائى فقد أشرك وإن الله عزَّ وجلَّ يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بى شيئا فإن جدة عمله قليله و كثيره لشريكه الذى أشرك به أنا عنه غنى (رواه أحمد)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে সালাত পড়ল সে শিরক করল, যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার জন্য সিয়াম পালন করল সে শিরক করল, যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার জন্য সাদকা দিল সে শিরক করল, আর আল্লাহ আয্যা ও জাল্লা বলেন-যে আমার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করেছে আমি তার জন্য সর্বোত্তম শরীক, কেননা তার আমলের স্বল্পবিস্তর সবটাই তার ঐ শরীকের জন্য যাকে সে শরীক করেছে। আমি তার থেকে অভাবমুক্ত। (আহমাদ)

ইবাদাতের ক্ষেত্রে গোপন শিরকের আলোচনা

গোপন শিরক ঃ- ডঃ ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আল-বুরাইকান তাঁর "আল-মাদখাল' নামক গ্রন্থে বলেন- "গোপন শিরক হচ্ছে হৃদয়ের এমন ইচ্ছা বা মুখের এমন কথা যাতে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহ সমান হয়ে যায়।" অথচ সে ইচ্ছা বা কথা এমন সংগোপনে বিরাজ করে যে, তাকে সহজে শিরক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। এ শিরকটি কখনো শিরকে আকবার আবার কখনো শিরকে আসগার হয়ে থাকে। গোপনীয়তার কারণে এ শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি সঠিকভাবে তা নির্ণয় করতে পারে না। তাই বড় শিরক হওয়া সত্ত্বেও তাকে ছোট শিরক মনে করে। আবার কখনো ছোট শিরক হওয়া সত্ত্বেও বড় শিরক মনে করে।

বস্তুতপক্ষে এ প্রকারটি শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার-এর মধ্যে দোদুল্যমান একটি প্রকার। যা গোপন দুর্বোধ্য, অতি সংগোপনে অতি সন্তর্পণে ইচ্ছা ও কথার সাথে মিশে থাকে।

এ প্রকারের শিরক সম্পর্কেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "শিরক কঠিন কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়ার গুটি গুটি পায়ে চলার চেয়েও সূক্ষ্ম ও গোপন।" (আশ্ শিরকু ওয়া মাজাহিরুহু- ৬৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন- "মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত এমন কথা বলে যা তাকে নিয়ে সত্তর বছর পর্যন্ত জাহান্নামের তলদেশের দিকে পড়তে থাকবে। অথচ সে ধারণাও করতে পারেনি যে, বাক্যটি এমন ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের মধ্যে গোপন শিরকের আরো একটি সাধারণ উপমা পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি সালাতে দাঁড়িয়ে দেখল যে, এক ব্যক্তি তার দিকে তাকিয়ে আছে তখন যে সালাতটি সাজিয়ে গুছিয়ে পড়ল।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (সাঃ) বের হলেন অতঃপর বললেন-

أيها الناس إياكم و شرك السرائر قالوا يا رسول الله ما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذالك شرك السرائر (سنن البيهقى)

অর্থাৎ- "হে লোকসকল ! তোমরা গোপন শিরক থেকে নিজদেরকে রক্ষা কর। তারা বললেন- হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) গোপন শিরক কী ? তিনি বললেন- কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়াল, অতঃপর পরিশ্রম করে সালাতকে সুন্দর করে আদায় করে, কেননা সে দেখেছে মানুষ তার প্রতি লক্ষ্য করছে। এটাই হল গোপন শিরক। (সুনানে বাইহাকী) তিনি আরো বলেন-

আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসা বা ঘৃণা করা ঈমানের অংগ। (আবু দাউদ) অতএব, আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনকারীকে ঘৃণা করা এবং তা লংঘনকারীকে ভালবাসা শিরক।

শিরকে আকবার ও শিরকে আসগারের হুকুম

এবার আমরা শিরকে আকবার ও শিরকে আসগারের বিস্তারিত হুকুম বর্ণনা করবো। (ইনশাআল্লাহ) যাতে এগুলোর পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। ডঃ ইবরাহীম তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে বলেন-

✪ শিরকে আকবার বান্দাহকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। শিরকে আসগার এ রকম নয়।

✪ শিরকে আকবার সামষ্টিক ও এককভাবে সমস্ত আমল বিনষ্ট করে দেয়। আর শিরকে আসগার শুধু সেই আমলকে নষ্ট করবে যে আমলের মূল শেকড় তথা নিয়্যত ও সূচনা পর্বের সাথে মিশে যাবে অথবা যে আমলে ইখলাছের চেয়ে এ শিরকের পরিমাণ বেড়ে যাবে। (যেমন- কোন ব্যক্তি মানুষকে দেখাবার জন্যেই সালাত শূরু করল অথবা ইখলাছের সাথে সালাত শুরু করার পর লৌকিকতা তার মনে প্রকট হয়ে উঠল।)

✪ শিরকে আকবার চিরস্থায়ী জাহান্নামী করে আর শিরকে আসগার এমনটি করে না। তা হয়ত সাময়িকভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে অথবা আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। তিনি চাইলে শাস্তি দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

✪ শিরকে আকবার জান-মালকে হালাল করে দেয়। (অর্থাৎ সে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার যোগ্য হয়ে যায়।) শিরকে আসগারকারী এ রকম নয়। কেননা সে ত্রুটিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী ও ফাসেক মুসলমান।

✪ শিরক বড় হোক আর ছোট হোক উভয়টিই সর্বোচ্চ কবীরা গুনাহ বা মহাপাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। উভয় শিরককারী আজাব ও ধমকির যোগ্য।

✪ শিরকে আকবার ক্ষমার অযোগ্য। (তাওবাহ ছাড়া) এর কোন ক্ষমা নেই। শিরকে আসগার (তাওবাহ ছাড়াও) ক্ষমা হতে পারে।

আমাদের দেশে প্রচলিত ৫টি শিরকের নাম ঃ-

১. শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বাণ প্রজ্বলন ও এতদুভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

২. মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো।

৩. শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাভরে নগ্নপদে মূর্তি-পূজারীদের মতো পুষ্পস্তবক অর্পণ।

৪. যাদু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- ‘যে যাদু করে সে শিরক করে।” (নাসাঈ)

৫. তাবিজ-তুমার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- “যে তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল।” (আহমাদ ও তাবরানী)

উপসংহার ঃ- আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, হুকুম-আহকাম লঙ্ঘন, নবী (সাঃ)-এর তরিকার পরিপন্থী যে কোন বিশ্বাস, কর্ম ও বক্তব্য একজন মুমিনকে শিরকের ফিতনা ও বিপর্যয়ে নিক্ষিপ্ত করে তাকে শিরক ও কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করার দিকে টেনে নিতে পারে। সকল পাপাচার কোন না কোন খাতে প্রবাহিত হয়ে শিরকের মোহনায় গিয়ে মিলিত হয়। যে কোন পাপই শিরকের লেজুড়বৃত্তি করে। সকল পাপই শিরকের বার্তাবাহক।

মহান আল্লাহ বলেন-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

(سورة النور-٦٣)

অর্থাৎ- “সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, ফিতনা (শিরক ও অনিষ্ট) তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” (সূরা নূর- ৬৩)

তাই একদিকে গায়রুল্লাহর দাসত্ব ও শিরক ধ্বংসকারী, আল্লাহর দাসত্ব ও একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাকারী কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর স্বীকৃতি, ধ্যান ও জ্ঞান এবং অপরদিকে পাপ বিধ্বংসী ইস্তেগফার আমাদের জন্য অপরিহার্য। তাইতো আল্লাহ বলেন-

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ-(سورة محمد-١٩)

অর্থাৎ- “জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন নিজের ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারীর জন্যে।”

(সূরা মুহাম্মাদ- ১৯)

তৃতীয় প্রশ্ন ও উত্তর

ভূমিকা ঃ- শায়ক মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উছাইমিন (রঃ) "শরহে উসুলুল ঈমান" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন "আক্বিদা ও শরীয়ার সমন্বয়ই হলো ইসলাম, উভয় ক্ষেত্রেই এটা পরিপূর্ণ।"

(ক) ইসলাম তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদের আদেশ দেয় এবং শিরক তথা অংশীদারিত্ব থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়।

(খ) সত্যবাদিতার আদেশ দেয়, মিথ্যাবাদিতা পরিহারের নির্দেশ দেয়।

(গ) ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দেয়, জুলুম হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়।

(ঘ) বিশ্বস্ততার আদেশ দেয় এবং খেয়ানত করতে নিষেধ করে।

(ঙ) অঙ্গীকার পূরণের আদেশ দেয়, বিশ্বাসঘাতকতা করা থেকে নিষেধ করে।

সারকথা ঃ- ইসলাম সর্বপ্রকার উন্নত চরিত্র ও পুন্য কাজের আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট স্বভাব ও খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা মুসলিম সমাজে শিরক, বিদায়াত, খেয়ানত, অবিচার, অনাচার, জুলুম-নির্যাতন, অশ্লীলতা, পর্দাহীনতা, ও মিথ্যার বেসাতিসহ ইসলাম বিবর্জিত বাতিল মতাদর্শের ছড়াছড়ি দেখতে পাই। যেমন- কোন কোন মতাদর্শে 'মা'বুদ বা উপাস্য বলতে কেউ নেই, পার্থিব জীবন শুধু বস্তুগত ব্যাপার মাত্র।' আবার কোন কোন মতাদর্শের দর্শন হলো "রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন ঃ- ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা ও ধর্মের হুরুমাত তথা নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে তুচ্ছ মনে করার হুকুম কী ? মূর্তি, প্রতিকৃতি, স্মৃতিস্তম্ভ ও অগ্নিশিখায় সম্মান জানানোর হুকুম কী ? সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কী ?

উত্তর ঃ উপস্থাপনা ঃ-

ঈমান ও কুফর বিপরীতমুখী দুটো পথ বরং পরস্পরের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী দুটো জীবন ব্যবস্থা এবং উভয়েরই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে রয়েছে উপায়-উপকরণ। ঈমানের মূল দায়িত্ব হল, মানব জীবনের এমন এক সমুন্নত লক্ষ্য স্থির করা যা তাকে চতুষ্পদ জন্তুর কাতার থেকে উর্ধ্বে তুলে ধরবে। যার ফলে তার জীবন ধাবিত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে।

পক্ষান্তরে কুফরের স্বভাবই হল জীবনের সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা এবং নৈতিক মূল্যবোধকে পাশ কাটিয়ে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসের লক্ষ্যে পরিচালিত করা। এ ভোগ-বিলাস সর্বস্ব মানুষদের সম্মুখে বাধা হয়ে দাঁড়ায় শুধু ঈমান ও লক্ষাভিমুখে তার যাত্রার সংগ্রাম। তাই কুফর ও ঈমানের সংগ্রাম চিরন্তন এবং ঈমানের প্রতি কুফরের বিদ্রুপও চিরন্তন।

প্রশ্নটি বড় বিধায় আমরা উক্ত প্রশ্নটিকে ক, খ, গ এ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে উত্তর প্রদানের প্রয়াস পাবো। (ইনশাআল্লাহ)

ক. ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ও ধর্মের হুরুমাত তথা নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে তুচ্ছ মনে করা কুফর। (তবে এর হুকুম সকল ধর্মের ক্ষেত্রে নয় বরং ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদিও অন্য ধর্মের কিছু নিয়ে বিদ্রুপ করা ইসলামী বিধানে এ জন্য সঙ্গত নয় যে, এর জবাবে তারাও ইসলামকে নিয়ে বিদ্রুপ করবে।)

ইরশাদ হচ্ছে-

...قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِه وَرَسُوْلِه كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ * لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ...- (سورة التوبة٦٥-٦٦)

অর্থাৎ- "বল ! তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রুপ করেছিলে ? তোমরা কোন আপত্তি বা ওজর পেশ করো না। নিশ্চয় তোমরা ঈমানের পর কুফর করেছ।"

(সূরা আত-তাওবা-৬৫ ও ৬৬)

বুঝা গেল উক্ত বিদ্রুপ বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা সুস্পষ্ট কুফর। ওলামায়ে কেরামের মতে এটি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার সর্বসম্মত ১০টি কারণের একটি।

খ. মূর্তি, প্রতিকৃতি, স্মৃতিস্তম্ভ ও অগ্নিশিখায় সম্মান জানানো শিরকে আকবার। কেননা মূর্তি, প্রতিকৃতি, স্মৃতিস্তম্ভ, অগ্নিশিখা কুরআনে বর্ণিত 'আসনাম' ও 'আওসানে'র অন্তর্ভূক্ত। আর এতদুভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এদের ইবাদাতের শামিল। মূর্তি, প্রতিকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন মূর্তি পূজারীদের ইবাদাত বিশেষ।

ইরশাদ হচ্ছে-

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ– (سورة ابراهيم–٣٥)

অর্থাৎ- "(ইবরাহীম (আঃ) বললেন) আমাকে এবং আমার বংশধরকে মূর্তিসমূহের ইবাদাত থেকে দূরে রাখুন।"

(সূরা ইবরাহীম-৩৫)

মূর্তি পূজা শিরক হওয়ার কারণে এটি ইসলাম ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ।

গ. সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম হলো, এরা প্রকাশ্যে কুফরে লিপ্ত রয়েছে।

এ তন্ত্র ও মতবাদগুলো আল্লাহর দ্বীনের বিরোধী, তাঁর আইন বিধানের বিরোধী। আল্লাহ বিরোধী, তাঁর আইন বিরোধী যে কোনো ব্যক্তি, বস্তু, তন্ত্র, মতবাদ সবই তাগুত। তাগুত মানে আল্লাহর অবাধ্য ও তাঁর আইন লঙ্ঘনকারী। তাগুত বিশ্বাস করা মানে আল্লাহর সাথে কুফর করা। কোন তাগুতের প্রতি বিশ্বাসীকে আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম বলে স্বীকার করেন না। এসব তন্ত্র ও মতবাদগুলোও মূর্তি। মূর্তির মতই লোকেরা এগুলোর ইবাদাত করছে। এগুলো অবয়ব বিহীন মূর্তি। মূর্তির সর্বাধুনিক সংস্করণ। মুমিন হতে হলে এগুলোকে বর্জন করতে হবে এবং তাওবা করে আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতির কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' নতুন করে পড়তে হবে। আল্লাহ বলেন-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا

(سورة البقرة–٢٥٦)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি তাগুতকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে সুদৃঢ় হাতল আঁকড়ে ধরল যা ছিড়বার নয়। (সূরা আল-বাকারা-২৫৬)

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো তাগুতকে অস্বীকার করা। আর তাগুতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো আল্লাহকে অস্বীকার করা। ইহুদী কা'ব ইবনু আশরাফের কাছে বিচার প্রার্থনা করার ফলে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশর নামক এক ব্যক্তিকে কতল করেছিলেন। (ইবনু কাসির)

এর অর্থ হলো আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কোন আইনের কাছে কোন মুসলমান বিচার প্রার্থনা করলে সে মুরতাদ হয়ে যায়। এ জন্যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কতল করেছিলেন। কৃষিক্ষেতে পানি সেচের বিষয়ে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এক ব্যক্তির ঝগড়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি নিষ্পত্তি করলে লোকটি বলল, যুবাইর আপনার ফুফাতো ভাই হওয়ার ফলে আপনি তার পক্ষে ফয়সালা দিয়েছেন। অর্থাৎ সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচার-ফায়সালায় সন্তুষ্ট হয়নি। এ জবাবে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন-

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً-(سورة النساء-٦٥)

অর্থাৎ- "অতএব তোমার পালনকর্তার কসম সে লোক ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মিমাংসার ব্যাপারে নিজের অন্তরে কোনো সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।

(সূরা নিসা-৬৫) (ইবনু মাজাহ)

অর্থাৎ ইসলামী আইন প্রত্যাখ্যান করা তো দূরের কথা অন্তরে ইসলামের কোন বিধানের ব্যাপারে যে ব্যক্তি সামান্য সংকীর্ণতা অনুভব করে আল্লাহ কসম করে তাকে বেঈমান ঘোষণা করেছেন। যে কোনো বিষয়ে বিচার-ফায়সালার জন্য কুরআন-সুন্নাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা ঈমানদার হওয়ার জন্য শর্ত।

আল্লাহ বলেন-

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
(سورة النساء-٥٩)

অর্থাৎ- "যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিবাদে লিপ্ত হও তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও।" (সূরা নিসা- ৫৯)

কাফেরদেরকে যে মুসলমান বন্ধুরূপে গ্রহণ করে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কাফেরদের আইন বিধানের কাছে বিচার-ফায়সালা চাওয়া তাদেরকে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করার নামান্তর। সুতরাং কাফেরদের আইনের কাছে যে ব্যক্তি বিচার-ফায়সালা চাইল সে কাফের সম্প্রদায়ের বন্ধু এবং তাদেরই একজন।

আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ– (سورة المائدة–٥١)

অর্থাৎ- "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে (কাফের) বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই একজন।"

(সূরা আল মায়েদা-৫১)

অতএব সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ বিশ্বাসীরা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী, কাফের। ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এটাই আল্লাহর কুরআনের উক্তি। কোন মুসলিম দেশে কুফরী আইন বলবৎ থাকার চেয়ে কোন আইন না থাকাই অনেক উত্তম। আইনশূন্য অবস্থায় একে অপরকে খুন করে ফেললে কুরআনের ভাষ্যমতে তাও ভাল। কেননা খুন হলে ক্ষণস্থায়ী জীবন নষ্ট হবে আর কুফরী আইন মেনে নিয়ে তার ছত্রছায়ায় বেঁচে থাকলে পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নামে জ্বলতে হবে। এ জন্যই কুরআন বলছে-

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ– (سورة البقرة–١٩١)

অর্থাৎ- "ফিতনাহ্ তথা কুফর ও শিরক করা খুনের চেয়েও ভয়াবহ।"

(সূরা আল বাকারা-১৯১)

গো-বাছুর পূজা করে কাফের হওয়ার ফলে আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাঈলের হাজার হাজার লোক একে অপরকে খুন করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেছিলেন। এ উম্মতের তাওবা কবুল হওয়ার জন্য কতল শর্ত করা হয়নি, শুধু কুফরী আইন বিধান পরিত্যাগ করে তাওবা করে আল্লাহর আইন বিধানের দিকে চলে আসলে উম্মতকে তিনি ক্ষমা করার ওয়াদা করেছেন। তাই পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাওবা করে আল্লাহর আইন বিধানের দিকে ফিরে আসুন। সরকার ও জনগণ সকলকেই আমরা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিচ্ছি।

চতুর্থ প্রশ্ন ও উত্তর

ভূমিকা ঃ- ডঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত্‌তুরকী (হাফিঃ) "শরহে আক্বিদায়ে ত্বাহাবিয়া" কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন "সালফে সালেহীন কুরআনে কারীমের পাশাপাশি সুন্নাতে নববীকে দলীল ও পথ প্রদর্শক হিসেবে যথেষ্ট মনে করেছেন।" আল্লাহ পাকের নাম ও গুণরাজির উপর বিশ্বাসের ব্যাপারে সালফে সালেহীনের আক্বিদা ছিল নিম্নরূপ ঃ-

ক. কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত আল্লাহ পাকের নাম ও গুণসমূহের অর্থ ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে সুস্পষ্ট। আরবি জানা যে কোনো মুসলমান এগুলোর অর্থ বুঝতে সক্ষম।

খ. আল্লাহ তা'য়ালার গুণরাজির ধরন ও প্রকৃতি অজানা, মানুষের বুদ্ধি-বিবেক তাঁর গুণরাজির ধরন বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই এগুলোর ধরণ সন্ধান করাই হল প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা।

গ. কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ পাকের যে সকল নাম ও গুণরাজির বর্ণনা এসেছে এগুলোর উপর ঈমান আনা অবশ্যই কর্তব্য। কেননা এগুলো অস্বীকার করা হল আল্লাহ পাক ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করার নামান্তর।

ঘ. আল্লাহ তা'য়ালার গুণরাজির ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করাই হলো বিদয়াত।

প্রশ্ন ঃ সালফে সালেহীনের মতানুযায়ী নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীসে আল্লাহ পাকের কোন কোন সিফাত বা গুণের প্রকাশ ঘটেছে ?

আয়াত ঃ ১

اَلرَّحْمٰـــنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى – (سورة طه–٥)

অর্থাৎ- "দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর অধিষ্ঠিত।" (সূরা ত্বাহা- ৫)

আয়াত ঃ ২

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ– (سورة الحديد–٤)

অর্থাৎ-"তোমরা যেখানেই থাক তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথে রয়েছেন।"
(সূরা হাদীদ-৪)

হাদীস ঃ- মুসলিম শরীফে হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম আস্‌সুলামী বর্ণিত হাদীসে আছে- "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈকা বাদীকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আল্লাহ কোথায়' ? তখন সে উত্তরে বলেছিল 'আকাশে'। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এই মহিলা মুমিনাদের অন্তর্ভুক্ত।".................

উত্তর ঃ অবতরণিকা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজ সত্তায় যেমন অদ্বিতীয়, সমকক্ষহীন ও অনুপম তেমনি তিনি আপন সুন্দরতম নামাবলী ও সমুন্নত গুণাবলীতেও অতুলনীয়, সাদৃশ্যহীন ও নিরূপম। এই গুণাবলী কুরআন ও সুন্নাহে ঠিক যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই বিশ্বাস করা আক্বিদাগতভাবে অপরিহার্য। এতে কোনরূপ মনগড়া ব্যাখ্যা, অর্থ বিকৃতি, সাদৃশ্য বর্ণনা, ধরন বর্ণনা বা কোনরূপ অস্বীকৃতি সম্পূর্ণ হারাম। এ বিশ্বাস পোষণ করেই আমরা বক্ষ্যমান প্রশ্নের উত্তর দানে প্রয়াসী হব।

আয়াত দু'টো ও হাদীসটির মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার যে সব গুণের প্রকাশ ঘটেছে তা আমরা ধারাবাহিকভাবে পৃথক পৃথক করে বর্ণনা করবো। (ইনশাআল্লাহ)

আয়াত ঃ ১

اَلرَّحْمـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى – (سورة طه–٥)

অর্থাৎ-"দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর অধিষ্ঠিত।" (সূরা ত্বাহা- ৫)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর দুটো সিফাত বা গুণ প্রকাশ পেয়েছে।

ক. রাহমান বা দয়াময়। এটি আল্লাহর জাতি ওজুদী সিফাত (সত্তাগত ইতিবাচক গুণ)। এ ধরনের গুণে তিনি অনাদী অনন্তকালব্যাপী গুনান্বিত। এ ধরনের গুণ কখনো তাঁর সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। আয়াতে বর্ণিত এ গুণটির অর্থ হল তিনি সীমাহীন দয়াময়, এমন দয়ার অধিপতি যা দিয়ে সকল সৃষ্টিকে দয়া করতে পারেন।

খ. ইসতাওয়া বা অধিষ্ঠিত হয়েছে। এটি ফে'লি (فعلى) ওজুদী (وجودى)সিফাত (ক্রিয়াগত ইতিবাচক গুণ)। এ ধরনের গুণগুলো আল্লাহর ইচ্ছা-ইরাদার সাথে সংশ্লিষ্ট। যখন ইচ্ছে এগুলো করেন আবার যখন চান এগুলো পরিহার করেন। আরশ সৃষ্টির পূর্বে ইসতাওয়া বা অধিষ্ঠান ক্রিয়াটি পরিত্যক্ত ছিল।

এ ধরনের গুণগুলো- قديمة النوع حادثة الأحاد

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা অনাদিকাল থেকেই এগুলো দ্বারা গুণান্বিত ছিলেন এবং অনন্তকালব্যাপী গুণান্বিত থাকবেন। তবে এগুলো তাঁর ইচ্ছেধীন হওয়ায় তিনি যখন চাইবেন প্রকাশ করবেন। আর যখন চাইবেন পরিত্যাগ করবেন। যেমন- হাসি, বিস্ময়, কিয়ামত দিবসে আগমন। এসব যখনই ইচ্ছে তখনই তিনি করেন।

(আল-মাদখাল- ৯১-৯২)

ইসতাওয়া শব্দটি দ্বারা আল্লাহ তাঁর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার গুণটি প্রকাশ করেছেন। তিনি আরশের উপরই বিরাজমান। সত্তাগতভাবে তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) বলেন- এ শব্দটির ব্যাখ্যায় সালফে সালেহীন থেকে ৪টি শব্দ বর্ণিত হয়েছে।

(১) ইসতাকার্‌রা (إستقرّ) অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

(২) আলা (علا) তথা সমুন্নত হয়েছেন।

(৩) ইরতাফায়া (ارتفع) তথা সমুচ্চ হয়েছেন।

(৪) সায়িদা (صعد) বা আরোহণ করেছেন।

এসব অর্থই এ কথা প্রকাশ করে যে, আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠিত। এবং এর সাথে আল্লাহর صفة العلو বা সর্বোচ্চ হওয়ার গুণটি এসে যায়।

আয়াত ঃ ২

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ- (سورة الحديد-٤)

অর্থাৎ"তোমরা যেখানেই থাক তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথে রয়েছেন।"

(সূরা হাদীদ-৪)

এ আয়াতে আল্লাহর সিফাতুল মায়িয়্যাহ (صفة المعية) বা সান্নিধ্য গুণটি প্রকাশ পেয়েছে। এটি দু'প্রকার। যথা ঃ-

ক. معية عامة সাধারণ সাথিত্ব। এটি সকল সৃষ্টিকেই শামিল করে। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর জ্ঞান, শক্তি, পরাক্রম ও বেষ্টনীর ক্ষেত্রে সকল কিছুর সাথেই রয়েছেন। অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান, শক্তি, পরাক্রম ও বেষ্টনীর বাইরে নেই। কোন কিছুই তাঁর থেকে অদৃশ্য হতে পারে না।

খ. معية خاصة বা বিশেষ সাথিত্ব। যা নির্দিষ্ট রয়েছে তাঁর রাসূল ও সৎকর্মশীল বন্ধুগণের জন্যে। এ সাথিত্বের অর্থ হল- তিনি তাদের সাহায্য-সহযোগিতা, ভালবাসা ও তাওফীক দিয়ে থাকেন। প্রয়োজন মুহূর্তে ইলহামের সাহায্যে তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। পবিত্র কুরআনে মুমিন, মুত্তাকী, ধৈর্যশীল ও সৎকর্মশীলদের জন্যে আল্লাহর এ সাথিত্বের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম হিজরতের সময় সাওর গুহায় আশ্রয় নেয়ার পর গুহামুখে কাফেরদের আগমনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিচলিত দেখে বলেছিলেন-

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا – (سورة التوبة–٤٠)

অর্থাৎ-"তুমি দুশ্চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" (সূরা তাওবা- ৪০)

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন- 'আরবি ভাষায় (مع) মা'আ শব্দটি দুটো বস্তুর সম্মিলন ও সংমিশ্রণকে বুঝায় না। অর্থাৎ গায়ে গায়ে লেগে থাকা এ শব্দটির অর্থ নয়। বরং তাঁর জ্ঞান, বেষ্টনী, সাহায্য, তাওফীক ইত্যাদির আওতায় থাকাকেই সাথে হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সমস্ত সালফে সালেহীন এ ব্যাপারে একমত।

হাদীস ঃ- মুসলিম শরীফে হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম আস্‌সুলামী বর্ণিত হাদীসে আছে, "রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈকা দাসীকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আল্লাহ কোথায়' ? তখন সে উত্তরে বলেছিল 'আকাশে'। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই মহিলা মুমিনাদের অন্তর্ভুক্ত।"

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হাদীসে আল্লাহর সিফাতুল উলু صفة العلو বা উর্ধ্বে অবস্থান করার গুণটি প্রকাশ পেয়েছে। যেমন- পবিত্র কুরআনে রয়েছে

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى–(سورة الاعلى–١)

অর্থাৎ-"তুমি তোমার সমুন্নত প্রভুর গুণগান কর।" (সূরা আ'লা-১)

বস্তুত আল্লাহ মর্যাদা ও পরাক্রমে, জাত ও সত্তাগতভাবে যেমন সবার উর্ধ্বে, তেমনি তিনি অবস্থানের দিক থেকেও সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর (রাহঃ) "মাজমুউল ফাতাওয়া" এ উল্লেখিত হয়েছে যে শাফী মাযহাবের কোন কোন ইমাম বলেন- আল কুরআনের প্রায় এক হাজার আয়াত দ্বারা আল্লাহর উর্ধ্বে অবস্থান করার গুণটি বুঝা যায়। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন-

আল্লাহ أعلى عليين তথা উর্ধ্বদের উর্ধ্বে বিরাজমান। অর্থাৎ তিনি সকলের উপর আকাশে বিরাজমান রয়েছেন। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে বলবে আল্লাহ আকাশে আছেন না জমিনে, তা-আমি জানি না। তবে সে কাফের। কেননা আল্লাহ বলেন- তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত। আর আরশ তো সপ্তাকাশের উপরেই রয়েছে। তাই আল্লাহর উর্ধ্বাকাশে আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়াকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে কাফের।

(মাজমু আল-ফাতাওয়া ৫ম খণ্ড, তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত-৭৪৮)

আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠিত রয়েছেন, এ আয়াতটি পবিত্র কুরআনে সাত বার উল্লেখ হয়েছে। অতএব আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান রয়েছেন এ বিশ্বাস পোষণকারী কাফের এবং ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন থেকেই সবকিছু জানেন, সর্বত্র সবকিছু দেখেন ও শুনেন। আরশের উপর সমাসীন হওয়ার সাতটি আয়াত নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ

(سورة الا عراف-٥٤)

অর্থাৎ-"তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন।

(সূরা আরাফ-৫৪)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ

(سورة يونس-٣)

অর্থাৎ "তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন।"

(সূরা ইউনুস-৩)

اللهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ- (سورة الرعد-٢)

অর্থাৎ-"আল্লাহ উর্দ্ধদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন, স্তম্ভ ব্যতীত তোমরা তা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন।"

(সূরা রা'দ- ২)

اَلرَّحْمـــنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى – (سورة طه–٥)

অর্থাৎ-"দয়াময় আরশে সমাসীন।" (সূরা ত্বাহা-৫)

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمـــنُ – (سورة الفرقان–٥٩)

অর্থাৎ-"অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন। তিনিই রহমান।

(সূরা ফুরকান-৫৯)

اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ

(سورة الم السجدة–٤)

অর্থাৎ-"আল্লাহ, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।

(সূরা আলিফ লাম মিম সাজদা-৪)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ

(سورة الحديد–٤)

অর্থাৎ-"তিনিই ছয়দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন হন।

(সূরা হাদীদ-৪)

বিঃ দ্রঃ আল্লাহ নিরাকার একথাটি নাস্তিকতার নামান্তর। তিনি নিরাকার নন। তিনি অজানা আকার। তাঁর চেহারা, হাত, চোখ, পা, আঙুল আছে। তবে এগুলো তাঁর বিশেষণ। তাঁর সত্তার ধরন-ধারণ, রূপরেখা কেমন এটা যেমন তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না তেমনি তাঁর চেহারা, হাত, চোখ, পা, আঙুল কেমন তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। তাঁর সত্ত্বার আকৃতি ও ধরণ-ধারণ জানা থাকলে তাঁর বিশেষণের ধরণ-ধারণ জানা সম্ভব হত। তাঁর সত্তার রূপ যেহেতু তিনি ছাড়া কারও জানা নেই সেহেতু তাঁর বিশেষণের আভিধানিক অর্থ ব্যতীত এর কোন রূপরেখা তিনি ভিন্ন আর কারোরই জানা নেই। এগুলোর রূপরেখা জানা সৃষ্টির ক্ষুদ্র জ্ঞানের বহু বহু উর্ধ্বে। আল্লাহ বলেন-

وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِه عِلْماً – (سورة طه–١١٠)

অর্থাৎ- "তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না। (সূরা ত্বাহা-১১০)

এগুলো কুরআন ও সুন্নাহে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) যেভাবে বর্ণনা করেছেন হুবহু সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। এগুলোর কোন আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা করা যাবে না। সৃষ্টিজগতের কোন কিছুর সাথে কিছুতেই তুলনা করা যাবে না। এগুলোর আভিধানিক অর্থের বাইরে কোনরূপ অর্থগত ও শব্দগত বিকৃতি করা যাবে না। এগুলোকে অর্থহীনও করা চলবে না কিছুতেই। কুরআন ও সুন্নাহে এগুলো যে রূপে বর্ণিত হয়েছে সেরূপই এগুলোর উপর ঈমান আনা ফরজ। এগুলো কেমন এ প্রশ্ন করা বিদয়াত ও ভ্রান্তি। আল্লাহর চেহারা সম্পর্ক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

(الصحيح لمسلم)

অর্থাৎ-"তাঁর পর্দা হল নূর বা জ্যোতি। যদি এ পর্দা তিনি খুলে দেন তবে তাঁর চেহারার জ্যোতিসমূহ তাঁর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তথা গোটা সৃষ্টিজগতকে জ্বালিয়ে দেবে। (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর সত্তার জ্যোতির সামান্যতম তাজাল্লি বা বহিঃপ্রকাশে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিরাকার হলে কিসের তাজাল্লিতে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হল ? আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাত সম্পর্কে বলেন-

يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ- (سورة الفتح-١٠)

অর্থাৎ-"আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।" (সূরা আল ফাতহ-১০)

তিনি তাঁর চোখ সম্পর্কে বলেন-

وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي-(سورة طه-٣٩)

অর্থাৎ-"যাতে তুমি (মূসা) আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।"

(সূরা ত্বাহা-৩৯)

অতএব প্রমাণিত হলো আল্লাহ নিরাকার নন। এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের আক্বিদা বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক।

পঞ্চম প্রশ্ন ও উত্তর

ভূমিকা ঃ- পরকালের ভয় অন্তরে জাগ্রত করা ও কবরবাসীদের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করার জন্য ইসলামী শরীয়ত কবর যিয়ারত বৈধ করেছে, কবরবাসীদের ওছিলা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নয়। ইসলামী শরীয়তে বৈধ ওছিলা হচ্ছে তিনটি-

১. আল্লাহ তা'য়ালার আসমা ও সিফাত তথা নাম ও গুণরাজির মাধ্যমে ওছিলা গ্রহণ করা।

২. নেক ও পুণ্য কার্যাবলীর মাধ্যমে ওছিলা গ্রহণ করা।

৩. জীবিত পুণ্যবান ব্যক্তিদের কাছে দোয়া চেয়ে ওছিলা গ্রহণ করা।

কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই, মানুষ এমন কার্যাবলী করে যা' রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন, যেমন তিনি হযরত আলী (রাঃ) কে মূর্তি ভেঙে ফেলতে এবং উঁচু কবরসমূহকে সমান করে দিতে পাঠিয়েছিলেন, বাস্তবে তিনি তা করেছিলেনও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "আল্লাহ তা'য়ালার লা'নত কবর যিয়ারতকারী মহিলা, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারী ও কবরে বাতি প্রজ্বলনকারীদের উপর।"

এছাড়া শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) 'তাফহিমাতুল ইলাহিয়্যাহ' নামক কিতাবে বলেন, কোন উদ্দেশ্য সফলের জন্য যদি কেউ আজমীর নগরী বা সালার মাসউদের (রঃ) কবরে বা এরূপ অন্য কারো মাজারে যায় সে গুরুতর অপরাধে অপরাধী হবে। তার এ অপরাধ হত্যা ও ব্যভিচার থেকেও মারাত্মক। সে হলো ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে কোনো মূর্তির পূজা করে আর যে লা'ত ও উয্‌যাকে ডাকে।

প্রশ্ন ঃ- শিরক ও বিদয়াতযুক্ত কবর যিয়ারত কী ? মাজারকেন্দ্রিক শরীয়ত বিরোধী ৫টি গর্হিত কাজের বর্ণনা দাও।

উত্তর ঃ- অবতরণিকা

মানব জাতির ইতিহাসে নেককার লোকদের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং তাদের মৃত্যুর পর তাদের কবরকেন্দ্রিক ইবাদাতবন্দেগী থেকেই

মূর্তিপূজার সূচনা হয়। যার ফলে কোটি কোটি বনি আদম জাহান্নামের পথে ধাবিত হয়। এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে কবরের শরয়ী সীমানাবহির্ভূত ভক্তি ও যিয়ারত থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং যারা এরূপ করবে তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। ইসলাম মুসলিম উম্মাহকে মসজিদমুখী হতে উদ্বুদ্ধ করে মাজারমুখী হতে নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور المساجد إنى انهاكم عن ذالك (صحيح لمسلم)

অর্থাৎ "তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবী ও পুণ্যবানদের কবরগুলোকে মসজিদ বানাতো। সাবধান ! তোমরা কবরকে মসজিদ বানিও না। আমি তোমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করছি।" (মুসলিম-১/২০১)

শিরক ও বিদয়াতযুক্ত কবর যিয়ারত কী ?

যে কবর যিয়ারতে কোনরূপ শিরক বা বিদয়াতের সংমিশ্রণ থাকবে তাই হচ্ছে শিরক ও বিদয়াতযুক্ত কবর যিয়ারত। শায়খ আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া আন্ নাজমী বলেন- শিরকযুক্ত কবর যিয়ারত হচ্ছে এমন যিয়ারত যাতে কবরস্থ ব্যক্তিকে ডাকা হয়, তার কাছে প্রয়োজন পূরণ, বিপদ দূর করা ও সমস্যা সমাধান করার প্রার্থনা করা হয়। এ ধরনের যিয়ারতকারী ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত।

বিদয়াতযুক্ত কবর যিয়ারত হচ্ছে এমন যিয়ারত যাতে কবরের পাশে সালাত আদায় করা এবং আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আল্লামা মুবারক ইবনু মুহাম্মদ আল মাইলি তাঁর 'আশ-শিরক ওয়া মাজাহিরুহু' নামক গ্রন্থে বৈধ-অবৈধ যিয়ারতকে সর্বমোট সাত ভাগে ভাগ করেছেন। আমরা শুধু শিরক ও বিদয়াতযুক্ত কবর যিয়ারতের প্রকারগুলো কিছু প্রয়োজনীয় হ্রাস-বৃদ্ধি সহকারে বর্ণনা করব। (ইনশাআল্লাহ)

১. زيارة الإستعانة বা কবরবাসীর নিকট সাহায্য কামনার্থে যিয়ারত। যেমন- যুদ্ধজয়, নির্বাচনে বিজয় লাভ, কোনরূপ সম্পদ লাভ কিংবা বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তাদের নিকট সাহায্য কামনা করা এটি শিরকযুক্ত যিয়ারত। কেননা আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে গায়েবী তথা অদৃশ্যভাবে সাহায্য কামনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেসব বিষয়ে আল্লাহ মানুষকে ক্ষমতা দেন নি সেগুলো কারো উপস্থিতিতেও তার কাছে কামনা করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মূলত সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে কোন রূপ ভায়া ও মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহর কাছে। কোননা আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন পর্দা নেই। কোন আড়াল বা অন্তরায় নেই। তিনি সরাসরি সকলকে দেখেন, শোনেন ও জানেন। তাই মাধ্যম গ্রহণের কোনই প্রয়োজন নেই। সরাসরি তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করতে হবে। কাউকে ভায়া হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ – (سورة الفاتحة–٤)

অর্থাৎ-"একমাত্র তোমারই ইবাদাত করছি (আর কারো ইবাদাত করছি না।) একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি (আর কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি না।"

(সূরা আল ফাতেহা- ৪)

কোন ভায়া বা মাধ্যম ব্যতিরেকে আল্লাহর ইবাদাত করা যেমনি ফরজ, তেমনি ভায়া বা মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করাও ফরজ। কবরবাসীকে ভায়া বানিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা শিরকে আকবার। মক্কার কাফেররা এমনিভাবে আল্লাহর সাহয্য কামনা করত। আল্লাহর কাছে কীভাবে সাহায্য চাইতে হবে পবিত্র কুরআনে তা তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন।

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ– (سورة البقرة–١٥٣)

অর্থাৎ-"হে ঈমানদার সমাজ ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা কর।

(সূরা বাকারা- ১৫৩)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حذّبه أمر صلّى (أبو داؤد)

অর্থাৎ"- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন বিষয় অস্থির করে তুললে তিনি সালাত পড়তেন। (আবু দাউদ)

যে কোন প্রয়োজনে দু'রাকাত নফল সালাত পড়ে সিজদার মধ্যে অথবা আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদ শেষে নিজের প্রয়োজনটি আল্লাহর কাছে জানালে আল্লাহ তা কবুল করবেন।

বিঃ দ্রঃ পুণ্যবান ব্যক্তিদের কাছে দু'আ কামনা করা ভায়া গ্রহণ করা নয়। ভায়াতো তখনই হবে যখন তাদের মধ্যে আল্লাহর কোন কাজে হস্তক্ষেপ করা অথবা তাদের কোন অদৃশ্য ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হবে।

পুণ্যবান ব্যক্তির কাছে দু'আ চাওয়ার স্বীকৃত নিয়মটি তাদের সম্মানার্থে করা হয়েছে। কারো কোন লাভ-ক্ষতি করা বা আল্লাহর উপর প্রভাব বিস্তার করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতেমাকে বলেন-

يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار لا أغنى عنك من الله شيئا (مسلم)

অর্থাৎ-"হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা ! (ঈমান ও সৎ কাজের মাধ্যমে) তুমি নিজেকে (দোযখ থেকে) রক্ষা কর। কল্যাণ-অকল্যাণ বিষয়ে আল্লাহ হতে আমি তোমার কোন উপকারই করতে পারব না। (সহীহ মুসলিম)

বর্তমান যুগে আক্বিদাবিশ্বাস সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কারণে কোন আলেম, খতিব, ইমাম কর্তৃক নিজেকে দু'আকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ঝুকিপূর্ণ। এতে সাধারণ মানুষ তাকে ভায়া মনে করে শিরকে আকবারে লিপ্ত হতে পারে। অতএব সাধারণ মানুষের আক্বিদা নষ্ট হতে পারে এমন যে কোন বিষয় থেকে দূরে থাকা উচিত।

২. زيارة استطلاع الغيب বা গায়েবী সংবাদ অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে যিয়ারত। এ প্রকারটি যদিও কবরবাসীদের সাথে যুক্ত নয় তবুও যেহেতু কবর বা মাজারে অবস্থানরত পাগল, ফকীর, পীর-দরবেশের নিকট কোন হারানো বস্তুর সন্ধান লাভের আশায় সাধারণ মানুষ যিয়ারত করে থাকে। তাই একে আমরা নিষিদ্ধ যিয়ারতের অন্তর্ভুক্ত করলাম। মূলত গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত আর কারোরই নেই। আল্লাহ বলেন-

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ – (سورة النمل–٦٥)

অর্থাৎ-"আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে তারা কেউই গায়েব জানে না। (সূরা নামল- ৬৫)

গায়েবের ইলম বা জ্ঞান আল্লাহ কাউকেই দেননি। এমনকি নবীগণকেও গায়েবের ইলম বা জ্ঞান দেননি। তবে তাদেরকে গায়েবের খবর দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-

ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ – (سورة يوسف–١٠٢)

অর্থাৎ-"এগুলো অদৃশ্যের খবর, আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি।

(সূরা ইউসুফ-১০২)

শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর ফলে গায়েবের খবর প্রেরণও আল্লাহর পক্ষ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব গায়েবের জ্ঞান তো

দূরের কথা গায়েবের খবরের দাবিদাররাও চরম মিথ্যাবাদী এবং এর বিশ্বাসীরা মিথ্যার বেড়াজালে বিভ্রান্ত।

৩. زيارة لدعاء الأموات বা সরাসরি কবরবাসীর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করার নিমিত্তে যিয়ারত করা। অনেক মুসলমান এমন ভ্রান্ত বিশ্বাস করে থাকে যে, তথাকথিত জীবিত বা মৃত গাউস-কুতুব, আবদাল ও মৃত সাধারণ ওলী আউলিয়াদের বিরাট ক্ষমতা রয়েছে। বিপদ-আপদে এরা হস্তক্ষেপ করতে পারে। এজন্যে এদের কবরে বা মাজারে গিয়ে সরাসরি প্রার্থনা জানায়। যা সরাসরি শিরকে আকবার। আল্লাহ্ বলেন-

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غَافِلُوْنَ –(سورة الاحقاف–٥)

অর্থাৎ-"ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্মন্ধে অবহিতও নয়।"

(সূরা আহক্বাফ- ৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন-

وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ– (سورة فاطر–٢٢)

অর্থাৎ-"আপনি কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম নন।" (সূরা ফাতির- ২২)

৪. زيارة التبرك বা কোন প্রয়োজন পূরণে মাজার বা মাজারস্থ মৃত ব্যক্তির দ্বারা উপকার বা বরকত হাসিল করার জন্যে যিয়ারত করা। এতে সৃষ্টির সাথে কোন কাজে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। যা সুস্পষ্ট শিরক।

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী বলেন البركة ثبوت الخير الإلهى فى الشئ 'বরকতের অর্থ হলো, কোন বস্তুর মধ্যে আল্লাহর পক্ষ হতে কোন কল্যাণ নিহিত থাকা।' কবর থেকে বরকত নেয়ার উদ্দেশ্যে যিয়ারত করার পক্ষে কোন দলিল নেই। যিয়ারতের উদ্দেশ্য হবে, পরকালের স্মরণ ও মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বৃক্ষের নিচে বাইয়াতে রিদওয়ান গ্রহণ করেছিলেন কালক্রমে লোকেরা তাবারুক বা বরকত হাসিলের জন্য সে বৃক্ষের নিচে সালাত পড়া শুরু করল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতে পেরে বললেন-

رجعتم إلى العزّى

অর্থাৎ-"তোমরা ওয্যা মূর্তির পূজায় প্রত্যাবর্তন করলে !" তারপর তিনি গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেন এবং সে স্থানে পুণরায় কেউ সালাত পড়তে গেলে তার গর্দান উড়িয়ে দেবেন বলে হুমকি দেন। (তারিখে তাবারী)

বস্তুত নূহ আলাইহিস সালামের জাতি তাদের ওলী-আওলিয়ার স্মৃতিচিহ্ন থেকে তাবাররুক অর্জন করতে গিয়ে কালক্রমে মূর্তিপূজায় পতিত হয়েছিল। তারও হাজার হাজার বছর পর মক্কার কাফেররা মসজিদে হারামের পাথরসমূহ থেকে তাবাররুক অর্জন করতে গিয়ে একই মূর্তিপূজায় আক্রান্ত হয়েছিল। ইতিহাসে তাবাররুক থেকেই শিরকের উৎপত্তি হয়েছে বলে জানা যায়।

(আশ্ শিরকু ওয়া মাজাহিরুহু- ৯৯)

হাফেজ ইবনু হাজার বলেন-

ثبت عن عمر أنه رأى الناس فى سفر يتبادرون إلى مكان فسال عن ذالك فقالوا قد صلى فيه النبى صلى الله عليه وسلم فقال من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا أثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا (فتح البارى ١/٤٥٠)

অর্থাৎ-"উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কোন সফরে মানুষদেরকে একটি স্থানের দিকে তৃড়িৎ গতিতে যেতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলে লোকেরা বললো- ঐ স্থানে নবী (সাঃ) সালাত পড়ছিলেন। তখন উমর (রাঃ) বললেন- এখানে কারো সালাতের সময় এসে পড়লে সে যেন সালাত পড়ে নেয়। তা না হলে এখান থেকে তার চলে যাওয়া উচিত। কেননা আহলে কিতাবরা তাদের নবীগণের স্মৃতিচিহ্ন সমূহ অনুসরণ করে সেগুলোকে গির্জা ও ইবাদাতের স্থান বানিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।" (ফাতহুল বারী- ১/৪৫০)

এ থেকে বুঝা যায় যে, কবর, মাজার, দরগাহ, দরবার শরীফ, খানকা শরীফ ইত্যাদিকে বরকতের স্থান মনে করা এবং এগুলোর মধ্যে ইবাদাত করা ও নেকী হাসিল করার উদ্দেশ্যে যাওয়া শিরক ও ধ্বংসের কারণ।

৫. زيارة تحصيل الفيوض তথা মৃত ব্যক্তির আত্মা থেকে তথাকথিত রূহানী ফায়েজ হাসিল করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা। অনেক সুফীবাদী ও পীরবাদীকে দেখা যায় তারা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কবরের পাশে মোরাকাবায় বসে এবং তার রূহ থেকে ফায়েজ হাসিলের সাধনা করে। কখনো তারা দাবি করে যে, কবরবাসীর আত্মার সাথে তাদের সাক্ষাত হয়।

৬. زيارة بقصد العبادة তথা ইবাদাতের উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা। যেমন- কবরের পাশে সালাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, যিকির-আযকার করা এগুলো সম্পূর্ণ বিদয়াত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলঅইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لعن الله اليهود إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (رواه أحمد-٥/١٨٤/١٨٥)

অর্থাৎ-"আল্লাহ ইহুদীদেরকে অভিসম্পাত করুন। তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ তথা ইবাদাতের স্থান বানিয়েছে। (আহমাদ-৫/১৮৪/১৮৫)

৭. زيارة بقطع مسافة السفر অর্থাৎ সফরের দূরত্ব অতিক্রম করে কোন কবর যিয়ারত করা। এটি বিদয়াতযুক্ত যিয়ারত। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হলেও তা বিদয়াত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و مسجدى هذا والمسجد الأقصى (البخارى مسلم أبو داؤد النسائى أحمد متفق على صحته)

অর্থাৎ-"মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা ব্যতীত ইবাদাতের উদ্দেশ্যে কোথাও সফর করা যাবে না। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ) হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে বিশুদ্ধ।

মাজারকেন্দ্রিক শরীয়ত বিরোধী ৫টি গর্হিত কাজ

১. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মাজারে গিয়ে সালাত আদায় করা। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر (الطبرانى ٥/١٤٥)

অর্থাৎ- "তোমরা কোন কবরের দিকে ফিরে নামাজ পড়ো না এবং কবরের পাশেও নামাজ পড়ো না।" (ত্বাবরানী)

২. মাজারে বাতি বা প্রদীপ জ্বালানো। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (النسائى-١/٢٨٧)

অর্থাৎ- "আল্লাহ কবর যিয়ারতকারিনী মহিলা ও যারা কবরকে মসজিদ বানায় এবং কবরে প্রদীপ জ্বালায় আল্লাহ্ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।"

(নাসাঈ- ১/২৮৭)

৩. কবরকে হাত দিয়ে মুছা, চুমু খাওয়া বা কবরের সাথে গণ্ডদেশ লাগানো। এটা সর্বসম্মতভাবে হারাম। কোন নবীর কবরে এমনটি করাও হারাম।

(আরবা আশারাত রিসালা-লি ইবনে তাইমিয়্যাহ, আল জামেউল ফারীদ- ৪৪৮)

৪. মাজারের খাদেম হওয়া ও পারিশ্রমিক নেয়া। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেছেন- "মাজারের খেদমত করে যে পয়সা নেয়া হয়, তা মূর্তির সেবাদাসদের নেয়া পয়সার মতই নাপাক।

(আল-জামেউল ফারীদ-৪৪৮)

আমাদের দেশের মাজারগুলো একেকটা সাক্ষাত মূর্তি। অতএব এগুলোর খাদেম হওয়া মূর্তির খাদেম তথা সেবাদাস হওয়ার নামান্তর। মূর্তির সেবাদাস হওয়া মুসলমানের জন্য হারাম এবং সেই সেবা হতে উপার্জিত অর্থ হারাম। কেননা হারাম কাজের বিনিময়ে যা নেয়া হয় তাও হারাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে-

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب و مهر البغى وحلوان الكاهن (مسلم-٢/١٩)

অর্থাৎ- "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, পতিতা মহিলার ব্যভিচারের বিনিময় মূল্য ও গণকের পারিশ্রমিক থেকে নিষেধ করেছেন।"

(মুসলিম- ২/১৯)

৫. কবরের উপর প্রাচীর বানানো। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

عن أبى سعيد الخدرى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور ويقعد عليها أو يصلى عليها (رواه أبو يعلى فى مسند ٢/٦٦ واسناده صحيح قال الهيثمى رجاله ثقات)

অর্থাৎ- "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর প্রাচীর বানানো, এর পাশে বসা অথবা নামাজ পড়া থেকে নিষেধ করেছেন।"

(আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেন।)

বিঃ দ্রঃ কবরের পাশে গিয়ে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া বিশুদ্ধ কবর যিয়ারত। হাত তুলে দু'আ করার কোন প্রয়োজন নেই। দু'আটি নিম্নরূপ ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْئَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ (مسلم)

অর্থ ঃ "হে মু'মিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইনশা আল্লাহ, আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হব। আমি আপনাদের জন্য ও আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।"

ষষ্ঠ প্রশ্ন ও উত্তর

ভূমিকা ঃ- ডঃ সালেহ আল ফাওজান তাঁর লিখিত 'আত-তাওহীদ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, বিদয়াত হচ্ছে কুফরের পূর্বাভাস, এটা দ্বীনের মধ্যে এমন নব আবিষ্কার বা হ্রাস-বৃদ্ধি যা আল্লাহ্ পাক বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৈধ করেন নি। বিদয়াত কবীরা গুণাহের চেয়েও নিকৃষ্ট। শয়তান বিদয়াতী কার্যক্রমে কবীরা গুনাহের চেয়েও বেশি খুশি হয়। কেননা কবীরা গুনাহকারী যখন গুনাহে লিপ্ত হয় তখন সে জানে এটা গুনাহের কাজ। ফলে এ কাজ থেকে তার তাওবা নসিব হওয়ার সম্ভবনা থাকে। পক্ষান্তরে বিদয়াতকারী যখন বিদয়াত করে তখন সে এটাকে দ্বীন মনে করে, আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের লক্ষ্যে করে থাকে ফলে তার তাওবা নসিব হয় না।

প্রশ্ন ঃ- ইসলামী শরীয়তে বিদয়াত এর হুকুম কী ? বিদয়াত প্রসারের প্রধান কারণগুলো কী কী ? আমাদের দেশে বিরাজমান ৫টি বিদয়াতের বর্ণনা দাও।

উত্তর ঃ- ইসলামী শরীয়তে বিদয়াতের হুকুম ঃ

বিদয়াত দু'প্রকার।

১. লৌকিক জীবন যাপনের উপায়-উপকরণে নব উদ্ভাবিত বিষয়াবলী। যেমন ঃ জীবন যাপনের আধুনিক উপকরণ ও আবিষ্কার সমূহ।

এ প্রকারের হুকুম ঃ এ ধরনের নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ বৈধ। কেননা বৈধতাই হচ্ছে জীবনের উপায়-উপকরণ সমূহের ক্ষেত্রে শরীয়তের সাধারণ বিধান।

২. দ্বীনি বিষয়ে নব উদ্ভাবনসমূহ অর্থাৎ দ্বীনের ক্ষেত্রে শরীয়তের অনুরূপ এমন তরিকা উদ্ভাবন করা যার উপর চলার মাধ্যমে তাই কামনা করা হয় যা শরীয়ার দ্বারা কামনা করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ-

"আল্লাহকে পাবার উদ্দেশ্যে সুফীদের আবিষ্কৃত কাদেরিয়া, চিশতিয়া, সাবেরিয়া, সরোয়ারদিয়া ইত্যাদি তরিকাসমূহ। আর রাসূলের প্রতি ভালবাসা প্রকাশার্থে মিলাদ পাঠ।"

এ প্রকারের হুকুম ঃ দ্বীনের ক্ষেত্রে এসব নব-উদ্ভাবিত বিষয় বা বিদয়াতসমূহ সম্পূর্ণ হারাম। এ ধরণের প্রত্যেকটি নতুন বিষয়ই গোমরাহী ও ভ্রান্তি। কেননা দ্বীনি বিষয়সমূহ (আল-ইবাদাত) সম্পূর্ণ তাওক্বীফ ও ইত্তিবা'অ তথা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক জানিয়ে দেয়া ও তার অনুসরণ করার উপর নির্ভরশীল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি আমাদের এ বিষয় তথা দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু উদ্ভাবন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরো বলেন-

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (ترمذى)

অর্থাৎ- "তোমরা নিজেদেরকে নব-উদ্ভাবিত বিষয় তথা নব-ইবাদাতসমূহ থেকে দূরে রাখ। কেননা প্রত্যেক নব-উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদয়াত আর প্রত্যেক বিদয়াত ভ্রান্তি ও গোমরাহী।" (তিরমিযী)

আল্লাহ বলেন-

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ– (سورة الشورى–٢١)

অর্থাৎ- "তাদের কি এমন শরীক মা'বুদসমূহ রয়েছে যারা দ্বীনের (ধর্মীয় ও জাগতিক) বিষয়ে এমন বিধান প্রবর্তন করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি।"

(সূরা শুরা-২১)

বিদয়াত প্রসারের প্রধান কারণগুলো কী কী ?

বিদয়াত প্রসারের প্রধান কারণগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো।

হাফেজ আবুল কাসেম হেবাতুল্লাহ তাঁর- 'শরহে উসূল এ'তেকাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' নামক গ্রন্থে বিদয়াত প্রসারের প্রধান পাঁচটি কারণ বর্ণনা করেছেন।

১. الغلو বা অতিরঞ্জন

এ অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে খারেজী ও শিয়া মাযহাব দুটো জন্মলাভ করেছে। খারেজী সম্প্রদায় শাস্তিমূলক আয়াত সমূহকে অতিমাত্রায় প্রয়োগ করে তাওবা, ক্ষমা, প্রতিশ্রুতি ও আশাব্যঞ্জক আয়াত সমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে কবীরা গুনাহগারকে তারা কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেছে। মু'তাজিলা সম্প্রদায় এদের পদচিহ্ন অনুসরণ করেছে। এদের মুকাবিলায় আত্মপ্রকাশ করেছে মুর্জিয়া সম্প্রদায়। যারা আশাব্যঞ্জক আয়াতসমূহে অতিরঞ্জিত আস্থা স্থাপন করে এ মত পোষণ করেছে যে, ঈমানের সাথে কোন পাপই ক্ষতিকর নহে।

শিয়া সম্প্রদায়টি ইয়াহুদী আব্দুল্লাহ ইবনু সাবার প্ররোচনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ বিশেষ করে আলী রদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবারবর্গের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত ভক্তি-শ্রদ্ধার বিদয়াত নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের এই বাড়াবাড়িমূলক ভক্তি-শ্রদ্ধাকে আরো বেশি তরঙ্গায়িত করে কারবালার প্রান্তরে হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত। বাড়াবাড়ির ধারাবাহিকতায় এরা তাদের ইমামদেরকে নবুয়্যত ও উলূহিয়্যাতের পর্যায়ে উন্নীত করে।

২. বিদআতের মুকাবিলায় বিদয়াত

বিদয়াত আরেকটি অনুরূপ বিদয়াত বা আরো বড় বিদয়াত দিয়ে মুকাবিলা করা। এ ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছে মুর্জিয়া, মু'তাজিলা, মুশাব্বিহা ও জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়। মুর্জিয়াদের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। খারেজী ও মুর্জিয়াদের মাঝামাঝি আরেক বিদয়াত নিয়ে আবির্ভূত হল মু'তাজিলা সম্প্রদায়। তারা বলল- কবীরা গুনাহগার মুমিনও নয় আবার কাফিরও নয়। বরং এরা মাঝামাঝি অবস্থানে থাকবে। তেমনিভাবে সিফাত অস্বীকারকারী জাহমিয়্যাহদের মুকাবিলায় আল্লাহর সিফাতসমূহকে সাব্যস্ত করার জন্য বলখ্ নামক নগরীতে আবির্ভূত হল মুক্বাতিল ইবনে সুলাইমানের নেতৃত্বে মুশাব্বিহা নামক উপদলটি। এরা আল্লাহর গুণরাজিকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে এতটাই বাড়াবাড়ি করল যে, আল্লাহর গুণরাজিকে সৃষ্টির গুণরাজীর সাথে তুলনা করল। এবং স্রষ্টাকে সৃষ্টির মত দুর্বল সীমিত গুণরাজি সম্পন্ন বলে সাব্যস্ত করল। অপরদিকে তাকদীর তথা সৃষ্টির জন্যে আল্লাহর পূর্ব পরিকল্পনা, ভাগ্যলিপিকে অস্বীকারকারী কাদরিয়া উপদলটির মুকাবিলায় আবির্ভূত হল

জাবরিয়্যাহ নামক আরেকটি উপদল, যারা তাকদীর ও ভাগ্যলিপির সাব্যস্তকরণে এতটাই বাড়াবাড়ি করল যে, তাকদীরের হাতে মানুষকে একেবারে পুতুলতুল্য বানিয়ে ফেলল এবং আল্লাহকে দোষারোপ করে নিজেদেরকে দোষমুক্ত ঘোষণা করল, যা কুফরের শামিল। যেমন ঃ বাংলাদেশের একটি গানে বলা হয়েছে-

পুতুলরূপে মাটি হতে বানাইয়া মানুষ
যেমনি নাচাও তেমনি নাচে পুতুলের কী দোষ।

অথচ ভারসাম্যপূর্ণ আক্বীদা হচ্ছে এ যে, মানুষ আল্লাহর দেয়া ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত ক্রিয়া-কর্ম করতে সক্ষম। উপরোক্ত উপদলগুলোর প্রত্যেকটি অপরের বিদয়াতকে খণ্ডন করতে গিয়ে তার সমান বা তারচেয়েও কঠিন আরেকটি বিদয়াত আবিষ্কার করেছে। যার ফলে ইসলামী সমাজে বিদয়াতের বিরাট প্রসার ঘটেছে। কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর মুকাবিলা করলে বিদয়াতগুলো বিন্দুমাত্র প্রসারলাভ করতে পারত না।

৩. ভিন্ন ধর্মসমূহের প্রভাব

বিদয়াত প্রসারের তৃতীয় প্রধান কারণ হল বিকৃত আক্বিদাসম্পন্ন মুসলিম উপদলসমূহের উপর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তথা ইয়াহুদী, খৃস্টান, অগ্নিপূজারী ও মূর্তিপূজারীদের প্রভাব। শিয়া উপদলটির গোড়াপত্তন হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা নামক ইয়াহুদীর হাতে যে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য বাহ্যত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইত তথা পরিবারবর্গ সম্পর্কে এত বাড়াবাড়িমূলক ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে শুরু করে যে, এক পর্যায়ে সে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে 'ইলাহ' বলে ঘোষণা করে।

প্রকাশ থাকে যে, এভাবেই ইয়াহুদীরা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর বেটা বলে খৃস্টান সমাজের মাঝে প্রচারণা চালায় এবং তাদেরকে ভ্রান্তির অন্ধকারে ফেলে ধ্বংস করে। উপরোক্ত ইবনু সাবা আরো প্রচার করে যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করেন নি বরং ঈসা আলাইহিস সালামের মত আকাশে উঠে গেছেন। অচিরেই তিনি দুশমনদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পৃথিবীতে নামবেন। তার এসব ভ্রান্ত আক্বিদা পরবর্তীতে শিয়া মাযহাবের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসলামের হাতে মার খেয়ে

পারস্যের অগ্নিপূজারীরা তরবারি ছেড়ে কুটিল ষড়যন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়। তারা ইসলামী অপ্রতিরোধ্য জোয়ারকে থামিয়ে দেয়ার জন্য ইবনু সাবার ভিত্তিকৃত শিয়া মতবাদটি লুফে নেয়। এবং নবী পরিবারের প্রতি অতি ভালবাসা প্রকাশ করে মুসলমানদের একটি বিরাট দলকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করল। খেলাফত বিষয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি জুলুম করা হয়েছে এমন একটি কথা ছড়িয়ে দিয়ে সে আবু বকর, উমর, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিন্দা জানাতে থাকল। এভাবেই একের পর এক বিদয়াত ও ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করে সাধারণ শিয়াদেরকে তারা ইসলাম থেকে বের করে ফেলল।

ভ্রান্ত কাদরিয়া উপদলটি গোড়াপত্তন হয়েছে (سنسويه) সানসুয়াই নামক এক খৃষ্টানের মতবাদ থেকে যার থেকে মতবাদটি শিখেছে মা'বাদ আল-জুহানী নামক একজন মুসলমান।

জাহমিয়্যাহদের সম্পর্কে ইবনু কাসীর (রঃ) ইবনু আ'সাকির থেকে বর্ণনা করেন যে, জা'য়াদ বিন দিরহাম নামক এক ব্যক্তি এ মতবাদটি শিখেছে বায়ান ইবনু সুময়ান থেকে। আর বায়ান তা শিখেছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু-টোনাকারী লাবিদ ইবনু আ'সাম ইয়াহুদীর ভাগনে ও জামাতা তালুত থেকে। (তালুত শিখেছিল উক্ত লাবিদ থেকে) আর লাবিদ শিখেছিল ইয়ামানের এক ইয়াহুদী থেকে। পরবর্তীতে এদের শিষ্য জা'য়াদ ইবনু দিরহাম থেকে এ মতবাদটি শিখেছিল জাহাম ইবনে সাফওয়ান। এবং তার মাধ্যমেই এ ভ্রান্ত মতবাদ মুসলিম সমাজের একাংশকে আক্রান্ত করে। জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় আল্লাহর গুণরাজিকে অস্বীকার করে। যা এক ধরনের নাস্তিকতা। আল্লাহর নিরাকার এ ভ্রান্ত নাস্তিক্যবাদী আক্বিদা এদের থেকেই বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে।

মুসলিম উম্মাতের সর্ববৃহৎ অংশটিকে আল্লাহ হেফাজত করেছেন। দুশমনরা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারেনি। যদিও অনেক ভ্রান্ত উপদল সৃষ্টি করতে তারা সক্ষম হয়েছিল।

৪. শরীয়ার বিষয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয়া

ইসলামী শরীয়ার বিষয়াবলীতে আকল তথা বিবেক-বিবেচনাকে বিচারক ও ফায়সালাকারী হিসেবে নির্ধারণ করা। বিদয়াতপন্থীরা মানুষের সীমিত জ্ঞানকে বিচারকের আসনে বসিয়ে দেয়ার ফলে মানবিক বিবেক ঊর্ধ্ব শরয়ী

বিষয়সমূহে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তাদের বিবেকপ্রসূত দুর্বল বিবেচনার পরিপন্থী হওয়ায় অনেক বিশুদ্ধ আক্বিদা সংক্রান্ত বিষয়কে অস্বীকার কিংবা অপব্যাখ্যা করেছে। তেমনিভাবে অনেক সহীহ হাদীসকে বিবেকবুদ্ধ না হওয়ায় অস্বীকার করেছে।

অনেকক্ষেত্রে সর্বসম্মত বিশ্বস্ত ন্যায়পরায়ণ সাহাবী ও তাবেয়ী রাবী তথা হাদীস বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করেছে। কবরের আজাব সংক্রান্ত সহীহ হাদীসগুলোকে এ কারণেই তারা অস্বীকার করেছে। আমর ইবনু ওবায়িদ নামক একজন মু'তাজেলী নেতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস সম্পর্কে বলছে- এটি যদি আ'মাশকে আমি বলতে শুনতাম তবে তাকে আমি মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম। আর জায়িদ ইবনু ওহাবকে এ কথা বলতে শুনলে তার ডাকে আমি সাড়া দিতাম না। আর আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদকে একথা বলতে শুনলে আমি গ্রহণ করতাম না। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলে তাঁকে আমি বলতাম তুমি তো এর উপর আমাদের অঙ্গীকার নাও নি।

(তারিখে বাগদাদ, আল মিলাল, আস-সুন্নাহ)

৫. গ্রীক ফিলসফি বা দর্শনশাস্ত্রের আরবি অনুবাদ ঃ

আব্বাসী খলীফা মামুনের সময়ে গ্রীক দর্শন ও পৌত্তলিক আক্বিদা বিশ্বাস সম্বলিত বইসমূহের অনুবাদ করা হয়। মুসলিম উম্মাতের একটি অংশ এ সব ভ্রান্ত দার্শনিক ও পৌত্তলিক মূলনীতি এবং পদ্ধতিসমূহ শিখে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এগুলো থেকে তারা যে মাপকাঠি তৈরি করে নেয় তা দিয়েই শরীয়ার বাস্তব সত্যতত্ত্বসমূহকে পরিমাপ করতে থাকে। কিতাব ও সুন্নাহর বাণীসমূহকে তাদের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ করিয়ে নেয়ার জন্যে বিকৃত ব্যাখ্যা করতে থাকে। যার ফলে মুসলিম উম্মাহ বিরাট বিপদ ও বিকৃতির সম্মুখীন হয়।

কালামশাস্ত্রবিদগণ ও সব মূলনীতি গ্রহণ করে তার সাথে আরো ভ্রান্তনীতি যোগ করে তা দিয়ে আল্লাহ সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহকে ব্যাখ্যা করতে থাকে। যার ফলে তাদের অনেকেই গোমরাহ হয়ে যায়। এ সবের অনুবাদের ফলে মুসলিম সমাজে যে ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তার পাশাপাশি দেখা দেয় কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানলাভে অনীহা ও ত্রুটি। যার ফলে মুসলিম উম্মাহর এ অংশটি বিদয়াত ও কুসংস্কারের অক্টোপাশে আবদ্ধ হয়ে যায়।

ভ্রান্ত গ্রীক দর্শনের অনুসরণে এরা আল্লাহ্‌র ইলম ও কুদরতকে তাঁর জাত বা সত্তা বলে আখ্যায়িত করেছে। অথচ এগুলো আল্লাহ্‌র মহান সত্তার গুণ মাত্র।

আমাদের দেশে বিরাজমান ৫টি বিদয়াত

১. সুফীবাদ তথা পীর-মুরিদী প্রথা।
২. ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
৩. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর হাত তুলে সামষ্টিক মুনাজাত।
৪. শিরনী-রুটির সমাহারে মনগড়া ইবাদাতসমূহের মাধ্যমে শবে বরাত পালন করা।
৫. নব উদ্ভাবিত যিকিরসমূহ।

যেমন ঃ- শুধু **'লা ইলাহা'**
শুধু **'ইল্লাল্লাহ'**।
শুধু **'আল্লাহ-আল্লাহ'**।
শুধু **'হু হু'** করা।
শুধু নাসিকার সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যিকির।

এ সব বিষয়ের পক্ষে শরীয়ার কোন দলিল নেই বিধায় এগুলো বিদয়াত এবং এর কোন কোনটি কুফর।

সপ্তম প্রশ্ন ও উত্তর

ভূমিকা ঃ- শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্ তামিমী (রঃ) তাঁর 'আল ওয়াজিবাতুল মুতাহাত্তিমাত .... ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারই ইবাদাত করা হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের স্থলে অন্য যারই শর্তহীন আনুগত্যে সন্তুষ্ট থাকা হয় তাকেই তাগুত বলে। তাগুত অনেক প্রকার হতে পারে। তন্মধ্যে প্রধান ৫টি হল ঃ

১. শয়তান, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা অন্য কিছুর ইবাদাত করতে আহ্বান করে।
২. আল্লাহ তা'য়ালার বিধানের পরিবর্তনকারী জালেম শাসক।
৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান অনুযায়ী শাসন করে।
৪. যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে ইলমে গায়েবের দাবি করে।
৫. আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদাত করা হয় এবং এ উপাস্য ঐ ইবাদাতে সন্তুষ্ট থাকে।

প্রশ্ন ঃ- ইসলাম ও ঈমানের আরকান কয়টি ও কী কী ? ইসলাম বিনষ্টকারী ১০টি বিষয়ের উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ- অবতরণিকা

ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ আর ঈমান অর্থ পূর্ণ আস্থা সহকারে বিশ্বাস স্থাপন। এ বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যে মহান ব্যক্তি অদৃশ্য আল্লাহর সমস্ত বিধান বিনা সংকোচে মেনে নেয় এবং তারই নির্দেশমত তা পালন করে চলে তাকেই বলা হয় মুমিন এবং তারই অপর নাম মুসলিম। যার প্রশংসায় পবিত্র কুরআন পঞ্চমুখ। তাই পরিপূর্ণভাবে ঈমান ও ইসলামের রঙে নিজের অন্তর-বাহিরকে রঙিন করে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হওয়ার জন্য প্রয়াসী হতে হবে।

ইসলামের আরকান

ইসলামের আরকান ৫টি। যথা ঃ

১. "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়া। অর্থাৎ-

✪ এর হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক অর্থ জেনে ✪ দৃঢ় বিশ্বাস ✪ ইখলস ✪ সততা ✪ ভালবাসা ✪ পূর্ণ আনুগত্য ✪ ও কবুল সহকারে এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই। তেমনিভাবে ✪ পূর্ণ আনুগত্য ✪ সত্যায়ন ✪ আদেশ-নিষেধ মেনে নেয়া ✪ ও শরীয়া অনুসারে ইবাদাত করার মানসিকতা নিয়ে এ সাক্ষ্য দেয়া যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর (প্রেরিত) রাসূল।

২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিপূর্ণভাবে দৈহিক ও আত্মিক সকল শর্ত পূরণ করে সালাত কায়েম করা। যাতে সকল সুন্নাত, মুস্তাহাব, ওয়াজিব ও ফরজসমূহ সহকারে সর্বাঙ্গীনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সমাজে বিরাজমান থাকে।

৩. যাকাত প্রদান করা। এটি হচ্ছে ইসলামের অর্থনৈতিক ইবাদাত। যার দ্বারা একজন মুসলিম কার্পণ্যের ব্যাধি থেকে পবিত্রতা লাভ করেন। এবং আল্লাহর ভালবাসাকে সম্পদের ভালবাসা থেকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে সক্ষম হয় এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়।

৪. রামাদানের সিয়াম পালন। যার মাধ্যমে একজন মুসলিম কামনা-বাসনা ও কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আত্মিক ও ঈমানী প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করে। এবং নিজ আত্মাকে পাশবিক শক্তির তুলনায় শাক্তিশালী করতে সক্ষম হয় এবং সিয়াম নামক ঢাল ব্যবহার করে পাপাচারসমূহ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। তাছাড়া রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধেও সিয়াম এক মহা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। যা দেহের বিষ-ক্রিয়া, স্থূলতা, কৌষিক রোগ, মানসিক ব্যাধি প্রতিরোধ করে।

৫. বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করা। যা একজন মুসলিমের জন্য আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের এক বিরাট আমলীরূপ। যা তার নাফস্ থেকে আল্লাহর বিরোধিতার শেকড়সমূহ উপড়ে ফেলে এবং একত্ববাদী প্রেরণায় তাকে উজ্জীবিত করে। কা'বার তাওয়াফ তাকে এ প্রশিক্ষণ দেয় যে, পুরো জীবনটি কা'বার রবের ইবাদাতকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে।

আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় দেখা যায় যে, মুসলিম উম্মাহ কা'বার চারপাশে যেভাবে তাওয়াফ করে মহাবিশ্বের ছোট-বড় সবকিছু একে অপরকে কেন্দ্র করে সেভাবেই তাওয়াফরত রয়েছে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করছে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে মাসে একবার তাওয়াফ করছে চন্দ্র আর সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী তাওয়াফ করছে বছরে একবার। গ্যালাক্সির কালো গহ্বরকে কেন্দ্র করে সূর্য তাওয়াফ করছে সময়ের এক বিরাট পরিসরে। এভাবেই আল্লাহর হামদ্ ও তাসবীহ সহকারে তাওয়াফরত রয়েছে গোটা মহাবিশ্ব।

আরকানুল ইসলামের দলীল

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة و الحج وصوم رمضان

(البخار ى و مسلم و اللفظ للبخار ى)

অর্থাৎ- "পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। সালাত আদায় করা। যাকাত প্রদান করা। হজ্জ পালন করা। রামাদানের সিয়াম পালন কার। (বুখারী ও মুসলিম)

আরকানুল ঈমান

ঈমানের আরকান ৬টি।

১. আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সহকারে আল্লাহর উপর ঈমান আনা। এর মর্ম হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে আল্লাহর প্রতি এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহই ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য, সত্যিকার মা'বুদ। বস্তুনিচয়ের তিনি স্রষ্টা ও অধিপতি, সকল পরিপূর্ণ গুণে পরমভাবে তিনি সকল বিষয়ে গুণান্বিত। সকল দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে তিনি পূর্ণ অবহিত। অনুগতকে প্রতিফল ও অবাধ্যকে শাস্তি প্রদানে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।

২. মালায়িকা বা ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা। এর মর্ম হল এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা রয়েছেন। তাদেরকে তিনি নিজ ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাদের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন যে-

لاَ يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ– (سورة الانبياء–٢٧)

"তারা আল্লাহর আগে ভাগে কোন কথা বলে না। বরং তারা আল্লাহর আদেশানুসারেই কাজ করে।" (সূরা আম্বিয়া- ২৭)

মালায়িকা অনেক প্রকার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। একদল আরশ উত্তোলন কাজে, অপর একদল জান্নাত-জাহান্নামের তত্ত্বাবধান, আরেকদল মানুষের আমলনামা সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এবার বিস্তারিতভাবে ঐসব মালায়িকার প্রতি বিশ্বাস করতে হবে যাদের নাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ- জিব্রাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল, মালেক, রিদওয়ান।

ইবনু আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

عن ابن عباس قال خلقت الملائكة كلهم من نور (ابن كثير ١/١١٢)

অর্থাৎ- "সকল মালায়িকাকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (ইবনু কাসীর ১/১১২)

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা। এর মর্ম হল, আল্লাহ তা'য়ালা নিজ সত্যের ঘোষণা এবং এর প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর নবী ও রাসূলগণের উপর বহুসংখ্যক ছোট-বড় কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এগুলোর প্রতি সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনতে হবে।

আর যে সব কিতাবের নাম আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন সেগুলোর প্রতি বিস্তারিতভাবে ঈমান আনতে হবে। যেমন ঃ তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। আর কুরআনের প্রতি শুধু ঈমান আনলেই চলবে না বরং তাঁর উপর আমল করা অপরিহার্য।

ইরশাদ হচ্ছে-

وَهـٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ – (سورة الانعام–١٥٥)

অর্থাৎ- "আর এটি এক মহা কল্যাণময় গ্রন্থ যা আমি অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং তাকওয়াপূর্ণ আচরণ বিধি গ্রহণ কর, তাহলে তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল হবে।"

(সূরা আনআম- ১৫৫)

'শরহুল আক্বিদা আত্ 'তাহাবিয়্যাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "কুরআনের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হল- তার স্বীকৃতি দেয়া ও অনুসরণ করা। এবং এ অনুসরণ অন্যান্য কিতাবের প্রতি ঈমান আনার উপর অতিরিক্ত বিষয়।"

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা। এর মর্ম হল, আল্লাহ তা'য়ালা আপন বান্দাদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে তাদেরকে তাঁর একত্ববাদ, ইবাদাত, বাতিল মা'বুদের অস্বীকৃতি ও ইহ-পরকালের সকল বিষয়ের নির্দেশনা দেয়ার জন্য বহুসংখ্যক সুসংবাদবাহী, ভীতি প্রদর্শনকারী ও সত্যের প্রতি আহ্বানকারী নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। এবং তারা যা যা সংবাদ দিয়েছেন তা সবই সত্য। আল্লাহর সকল সংবাদই তারা সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়েছেন। তারা সকলেই আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ ছিলেন। রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট্য তাদের ছিল না।

ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ – (سورة النحل-٣٦)

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এ মর্মে রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতকে পরিহার কর।"

(সূরা আন-নাহল- ৩৬)

সকল রাসূলের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনতে হবে সবিস্তারে। আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর রেখে যাওয়া আইন-বিধান ও ফায়সালা মেনে নিতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে-

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً– (سورة النساء-٦٥)

অর্থাৎ- "অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম! সে লোক ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।"

(সূরা ঃ আন্ নিসা- ৬৫)

৫. আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনা। এর মর্ম হল, আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহর তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল যা সংবাদ দিয়েছেন তার প্রতি দৃঢ়

বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমনঃ- কবরের প্রশ্নোত্তর, কবরের আযাব ও শাস্তি, কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, দাঁড়িপাল্লা, পুলসিরাত, প্রতিফল প্রদান, ডান অথবা বাম হাতে আমলনামা বিতরণ, হাউজে কাউসার, জান্নাত-জাহান্নাম ও আল্লাহর সাক্ষাত এবং কিয়ামতের পূর্বে যে সব আলামত আসবে সে সবের প্রতি ঈমান। ইরশাদ হচ্ছে-

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ- (سورة البقرة-٤)

অর্থাৎ- "আর তারা পরকালের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।" (সূরা বাক্বারাহ- ৪)

৬. ভাল-মন্দ তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা। এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চারটি ধারাবাহিক বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে।

(ক) এ বিশ্বাস করা যে, বস্তুনিচয়ের সৃষ্টির পূর্বে এবং বান্দারা তাদের আমল করার পূর্বে অনাদিকালেই আল্লাহ এসব বিষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

ইরশাদ হচ্ছে-

لِتَعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
(سورة الطلاق-١٢)

অর্থাৎ- "যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান এবং এ কথাও জানতে পার যে, আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।"

(সূরা আত্ তালাক-১২)

(খ) এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ পাক যা কিছু নির্ধারিণ ও সম্পাদন করেছেন সবকিছুই লাওহে মাহফুজের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِيْنٍ- (سورة يس-١٢)

অর্থাৎ- "এবং আমি প্রতিটি বস্তু একটি স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।
(সূরা ইয়াসিন- ১২)

(গ) এ বিশ্বাস করা যে, সকল বিষয়েই আল্লাহর কার্যকরি ইচ্ছে, সর্বব্যাপ্ত ইরাদা ও পরিপূর্ণ কুদরত রয়েছে। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয় এবং যা ইচ্ছে করেন না, তা হয় না। বান্দা কোন ভাল অথবা মন্দ কাজের ইচ্ছে করলে আল্লাহ যদি তা অনুমোদন করেন তবে সে তা করতে পারে। আল্লাহর অনুমোদন না করলে সে তা করতে পারে না। কেননা বান্দার কোন কাজ

করার নিজস্ব শক্তি নেই। শক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। বান্দা পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হয় তার ইচ্ছার কারণে। সে ভাল ইচ্ছা না করলে আল্লাহ জোরপূর্বক ভাল করাবেন না। সে ভাল করতে চাইলে তার চাওয়ার কারণে আল্লাহ তাকে নিজের অনুমোদন সাপেক্ষে ভাল করার ক্ষমতা দেবেন। মন্দ চাইলে অনুমোদন শর্তে মন্দ করার ক্ষমতা দেবেন। কেননা ভাল মন্দ পরীক্ষার জন্য তাকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ –(سورة الحج–١٨)

অর্থাৎ- "আল্লাহ যা ইচ্ছে তা করেন।" (সূরা হাজ্জ- ১৮)

(ঘ) এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহই মহাবিশ্বের জানা-অজানা সকল কিছুর স্রষ্টা। সকল বস্তুর সত্তা, গুণ ও স্পন্দন সহ সবই তাঁর সৃষ্টি। ইরশাদ হচ্ছে-

اَللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ– (سورة الزمر–٦٢)

অর্থাৎ- "আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর কর্মবিধায়ক।"

(সূরা যুমার-৬২)

ফলকথা, ভাগ্যের উপর ঈমান বলতে আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামায়াতের মতে উপরোক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনাকেই বুঝায়। পক্ষান্তরে বিদয়াতপন্থীরা এর কোন কোনটি অস্বীকার করে।

ইসলাম বিনষ্টকারী ১০টি বিষয়

ইসলাম ভঙ্গের সর্বসম্মত ১০টি কারণ নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ-

১. আল্লাহর সাথে শিরক (শিরকে আকবার) করা। যে ব্যক্তি শিরক করল সে কুফর করল এবং তার ইসলাম ভঙ্গ হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছে-

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ– (سورة الزمر–٦٥)

অর্থাৎ- "নিশ্চয় তুমি যদি শিরক কর তবে তোমার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। এবং তুমি হয়ে যাবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"

(সূরা যুমার -৬৫)

২. আল্লাহ ও নিজের মধ্যে ছায়া বা মাধ্যম সাব্যস্ত করে তাদেরকে ডাকা, তাদের নিকট শাফায়াত কামনা করা, তাদের উপর তাওয়াক্কুল করা। যে ব্যক্তি এমন করে সে সর্বসম্মতভাবে কাফের। যেমন ঃ- মক্কার কাফেররা

নবী-রাসূল ও ওলী-আওলিয়াকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে তাদের মূর্তি বানিয়ে পুজা করত। তারা বলত-

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى-(سورة الزمر-٣)

অর্থাৎ- "আমরা তাদের ইবাদাত এ জন্যই করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।"

(সূরা যুমার-৩)

রাসূলগণ আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যে মাধ্যম বটে কিন্তু এর অর্থ শুধু সংবাদ পৌঁছানোর মাধ্যম। পৌত্তলিক ধারণা সম্বলিত মাধ্যম তারা নন। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কাউকে পৌছিয়ে দেয়া, কাউকে ওলী বানিয়ে দেয়া বা নিজ ক্ষমতাবলে কারো জন্য সুপারিশ করা, অথচ কারো ইহ-পারলৌকিক উন্নতি ও মুক্তি পাইয়ে দেয়া সম্পূর্ণভাবে তাদের ক্ষমতার বাইরে।

অনেক সূফীবাদী বিশ্বাস করে তাদের কুতুবের হাতে দিওয়ানুস সালেহীন বা ওলী-আউলিয়ার দপ্তর রয়েছে। তারা সন্তুষ্ট হলে কারো নাম আউলিয়ার খাতায় তুলে দিতে পারেন এবং অসন্তুষ্ট হলে তাদের নাম কেটে দিতে পারেন। আল্লাহর ওলী-আউলিয়া বানাবার ইখতিয়ার তাদের হাতে। সে জন্যেই ভায়া বা মাধ্যম মনে করে তাদের হাতে বাইয়াত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মক্কার কাফেরদের বিশ্বাস এরূপই ছিল এবং এটিই মূর্তিপূজা। (আশ-শিরক ওয়া মাজাহিরুহু)

ইরশাদ হচ্ছে-

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ- (سورة التوبة- ٣١)

অর্থাৎ- "তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশ সম্প্রদায়কে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে।"

(সূরা আত-তাওবা-৩১)

৩. যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের মনে করে না অথবা তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের শিরকী ধ্যান-ধারণা ও মতবাদকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে তবে সে কুফর করল।

ইরশাদ হচ্ছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ -(سورة التوبة)

অর্থাৎ- "হে ঈমানদার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই মুশরিকরা নাপাক।"

(সূরা আত-তাওবা-২৮)

আজকাল অনেক মুসলমান ইসলামের পাশাপাশি পৌত্তলিকদের ধর্মমতকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে, কুরআন শোনার পাশাপাশি গীতা শুনে এবং সঠিক বলে বিশ্বাস করে। বলাবাহুল্য এহেন বিশ্বাসে নিশ্চয়ই এদের ইসলাম ভঙ্গ হয়ে গেছে।

৪. যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বস করবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াতের চেয়ে অপর কারো হিদায়াত অধিক পূর্ণাঙ্গ অথবা রাসূলের দেয়া বিধি-বিধানের চেয়ে অপর কারো বিধি-বিধান অধিক সুন্দর। তবে সে ব্যক্তির ইসলাম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আজকাল লক্ষ লক্ষ মুসলিম নামধারী ব্যক্তি এ ধরনের বিশ্বাসে লিপ্ত। কেউবা রাসূলের হেদায়াতের চেয়ে চিশতি, নকশেবন্দি, কাদেরী ইত্যাদি তরিকার হেদায়াতরূপী বেদায়াতকে অধিক পূর্ণাঙ্গ মনে করছে। আবার কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও আইন বিধানের চেয়ে অন্যদের আবিষ্কৃত এ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে অধিক সুন্দর মনে করছে। জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এসব প্রেমিকরা কি প্রকৃত অর্থে মুসলিম থাকতে পারে ?

৫. যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত কোন জিনিসকে ঘৃণা করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও বাহ্যিকভাবে সে এর উপর আমল করে। ইরশাদ হচ্ছে-

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ– (سورة محمد–٩)

অর্থাৎ "এটা এ জন্য যে, এরা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাকে ঘৃণা করে, ফলে আল্লাহ তাদের আমলকে বাতিল করে দিয়েছেন।"

(সূরা মুহাম্মদ -৯)

আজকাল অনেক মুসলমানকেই পর্দা, দাড়ি, ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী শিক্ষা, আযান ইত্যাদিকে ঘৃণা করতে দেখা যায়। এ ধারাটি এদের উপর প্রযোজ্য।

৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দ্বীনের কোন বিষয় বা তার পুরস্কার বা শাস্তিকে বিদ্রূপ করবে সে কাফের। ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ أَ بِاللهِ وَآيَاتِه وَرَسُوْلِه كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ

(سورة التوبة– ٦٥–٦٦)

অর্থাৎ- "বল ! তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রূপ করছিলে ? তোমরা কোন ওজর পেশ করো না। নিশ্চয় ঈমানের পর তোমরা কুফর করেছ।"

(সূরা ঃ আত্ তাওবা- ৬৫ ও ৬৬)

আমাদের দেশের অধিকাংশ নাট্যানুষ্ঠানে খারাপ চরিত্রের অভিনয়ের জন্যে দাড়ি, টুপী ও ইসলামী পোশাককে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আল কুরআনের কোন শব্দ বা আয়াত, কোন ঘটনা প্রসঙ্গে বিশেষ কোন নবীর নাম, কেউ কেউ এমনভাবে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করেন যাতে বিদ্রূপ বুঝা যায়। এ ধরনের বিদ্রূপ উদ্দেশ্যমূলক হোক বা হাসি-ঠাট্টামূলক হোক উভয়ই কুফর।

৭. যাদু-টোনা করা। যেমন, কাউকে আপোস করার জন্যে কিংবা বিচ্ছিন্ন করার জন্যে যাদু-টোনা করা। এরূপ যে করবে বা এর উপর সন্তুষ্ট থাকবে সে কাফের। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ – (سورة البقرة–١٠٣)

অর্থাৎ- "যে কেউ যাদু অবলম্বন করে তার জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই।"

(সূরা বাক্বারা-১০৩)

এদেশে পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যাদু-টোনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। স্বামীর মন পাওয়ার জন্য স্ত্রী বা স্ত্রীকে বশে রাখার জন্য স্বামী কর্তৃক যাদু-টোনা ও তাবিজ-তুমার করা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। আবার ছেলে যাতে স্ত্রীর প্রতি অধিক আসক্ত হয়ে মা-বাবাকে ভুলে না যায় সে লক্ষ্যেও মা-বাবা ছেলের জন যাদু-টোনা করে থাকেন। তেমনিভাবে মেয়ে জামাতাকেও মেয়ের প্রতি সর্বদা আসক্ত রাখার জন্য শাশুড়ীগণ যাদু-টোনা করে থাকেন। শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা মেরে ফেলার জন্য যাদু-টোনার ব্যবহার আমাদের সমাজে খুবই প্রচলিত। যাদু কুফর হওয়ার কারণে এ সব ব্যক্তির মুসলমানিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়।

৮. মুশরিকদের সাহায্য করা অথবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করা। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ – (سورة المائدة–٥١)

অর্থাৎ- "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে সে তাদেরই একজন।"

(সুরা আল-মায়েদা- ৫১)

যেমন- আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী রয়েছে যারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা, বক্তব্য ও লেখনি শক্তি দিয়ে পৌত্তলিকদের সহযোগিতা করে যাচ্ছে। কেউবা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠকে ইবাদাততূল্য বলে তার পৌত্তলিক কাব্য সাহিত্যের সহযোগিতা করছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে মুসলিম লেখকদের লেখাগুলো কমিয়ে দিয়ে বা বাদ দিয়ে মুশরিক লেখকদের লেখাগুলো পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করে মুসলিম লেখকদের বিরুদ্ধে মুশরিক লেখকদেরকে সাহায্য করছে। আবার কেউবা কোন অঞ্চলে চুক্তি করে পৌত্তলিকদের লালন ও মুসলিমদের দমন করছে। এসবই স্পষ্ট ও সর্বসম্মত কুফর।

৯. ঐ ব্যক্তি কাফের, যে মনে করে যে, কিছু কিছু মানুষ (চেষ্টা-সাধনায়) এমন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যে, তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত মান্য করার তার আর প্রয়োজন থাকে না। এ ব্যাপারে তারা মুসা আলাইহিস সালাম ও খাজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনাকে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। অথচ সে ঘটনার সাথে তাদের এ ধারণার আদৌ কোন সামঞ্জস্য নেই। কেননা প্রথমত খাজির আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় ও তাঁর নবুয়্যত সীমানার বাইরে ছিলেন। দ্বিতীয় ঃ বিশুদ্ধমতে খাজির আলাইহিস সালাম সৃষ্টির ভাঙ্গা-গড়া বিষয়ক নবী ছিলেন। তাই তিনি মুসা আলাইহিস সালামের শরীয়ার অন্তর্ভুক্তই ছিলেন না। অনেক ভ্রান্ত বাতেনী মারেফাতপন্থী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ার বাইরে মনে করে। তারা বলে, আমরা তো হাক্বীকাতের মঞ্জিলে পৌঁছে গেছি। অতএব, সাধারণের জন্যে উপযোগী শরীয়ার আমাদের প্রয়োজন নেই। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصر انى ثم يموت ولم يؤمن
بالذى أرسلت به إلاكان من أصحاب النار (مسلم، مشكاة-١٢)

অর্থাৎ- "এ উম্মতের কোন ইহুদী ও খ্রিস্টান যদি আমার কথা শোনে, অতঃপর আমার উপর ঈমান না আনে, তবে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

(সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ১২)

আল্লাহ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ওলী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেন-

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ- (سورة الحجر-٩٩)

অর্থাৎ- "আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদাত কর মৃত্যু আসা পর্যন্ত।"

(সূরা আল-হিজর- ৯৯)

সুতরাং বুঝা গেল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কারো জন্যেই রাসূলের শরীয়ার বাইরে যাবার কোন সুযোগ নেই।

১০. আল্লাহর দ্বীন (জীবন বিধান) থেকে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে রাখা যে, তা শেখেও না, আমলও করে না, তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করে না। এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইসলাম অনুসরণ রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে মুরতাদ।

ইরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ أُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ – (سورة الاحقاف–٣)

অর্থাৎ- "যারা কাফের তারা ভীতি প্রদর্শিত বিষয়সমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"

(সূরা আহক্বাফ- ৩)

আমাদের দেশে এমন লোকের অভাব নেই। অনেকে আছেন কয়েকটা ডিগ্রী লাভ করেও অজুটা ঠিকমত করতে পারেন না। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন ফজরের সালাত বার রাকাত। অনেকে পূজামণ্ডপে বা আশ্রমে গিয়ে সুপ্রসন্ন ও সন্তুষ্টচিত্তে ওম্ শান্তি, ওম্ শান্তি- অভিবাদন, শঙ্খ ধ্বনির অভিনন্দন গ্রহণ করে পৌত্তলিকদের হাতে, নিজের কপালে সিঁদুর-তিলক লাগালে কী হয় সে মাসআলাটুকুও জানেন না। তিনি কি তখন আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের উম্মত থাকেন না কি রাম-দাস হয়ে যান সে পার্থক্যটুকুও জানার সৌভাগ্য ও জ্ঞান তার নেই। আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জানার এ অনাগ্রহ ও অনীহাকেই সর্বশেষ এ ধারায় সর্বসম্মতভাবে ওলামায়ে কিরাম কুফর বলেছেন।

অষ্টম প্রশ্ন ও উত্তর

ভূমিকা ঃ- শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রঃ) তাঁর 'আত্ তাহফাতুল ইরাকিয়া' গ্রন্থে বলেন- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত হল ঈমানের মৌলিক ও অবশ্য করণীয় বিষয়াবলীর অন্যতম, এটা ঈমানের শ্রেষ্ঠতম একটি মূল ভিত্তি।

আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তা'য়ালা জ্বিন ও ইনসানের কাছে তাঁকে নবী করে পাঠিয়েছেন। তাঁর রেসালতের মাধ্যমে নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে, ফলে তিনিই খাতামুন নাবীয়্যিন, তাঁর পরে আর কোন নবী ও রাসূল আসবেন না। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রেসালতকে বিভিন্ন মো'জেজা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। তাঁকে সকল নবীদের উপরে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। তাঁকে এমন বৈশিষ্ট্যাবলী দান করেছেন যা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। যেমন- শাফায়াতে কুবরা, আল কাউসার, আল হাউজ, আল মাকাম আল মাহমুদ। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সারা বিশ্বে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে ও একমাত্র তাঁরই ইবাদাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাহমাতুল্লীল আলামীন করে পাঠিয়েছেন। তাঁর উম্মতকে অন্যান্য সকল নবীদের উম্মতের উপরে মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাব্বতকে আমাদের জন্যে ফরজ করেছেন এবং তাঁর অনুসরণ ফরজ বা অবশ্য করণীয় করেছেন।

প্রশ্ন ঃ- কালেমা তাইয়্যিবার দ্বিতীয়াংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলতে কী বুঝ ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মানব বংশোদ্ভূত নাকি অন্য কিছু ? ইবাদাত সঠিক হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ অবতরণিকা

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন নবুয়্যত প্রাসাদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নয়নাভিরাম ইট। যাঁকে দিয়ে এ প্রাসাদের

সমাপ্তি ও পূর্ণতা বিধান করা হয়েছে। যাঁকে দেয়া হয়েছে সর্বশেষ রিসালাত, সর্বজনীন, সর্বকালীন নবুয়্যত ও ইমামত, কালজয়ী শরীয়ত ও সুসংরক্ষিত কিতাব। যাঁকে দেয়া হয়েছে নির্ভুল আইন-বিধান, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি। সমগ্র মানবজাতির সৌভাগ্য সীমাবদ্ধ করা হয়েছে তাঁর প্রতি ঈমান ও তাঁর অনুসরণের উপর।

তিনি উম্মতের ইমামে আযম ও উসওয়ায়ে হাসানা। তাঁর সহীহ সুন্নাহ্ই হচ্ছে উম্মতের মাযহাব। ছায়াবান বস্তুর সাথে ছায়া যেমনি চলে তেমনি আমাদেরকে চলতে হবে তাঁর পদাংক অনুসরণে তাঁর সুন্নাহর সাথে। তাই বিদয়াত পরিহার করে আমাদেরকে আসতে হবে সুন্নাতের দিকে, অন্ধ তাকলীদ পরিত্যাগ করে আসতে হবে ইত্তেবা ও অনুসরণের দিকে। আমরা যদি সংকল্প করি যে, জীবনের কোন বিশ্বাস, কথা, কাজ, চাহনি, শ্রবণ, পানাহার, নিদ্রা, পদচারণা, আচার-ব্যবহার, ইবাদাত, আখলাক, বিচার-ফয়সালা, মুয়ামালা এক কথায় কোন ক্ষেত্রেই রাসূলের সুন্নাতের বাইরে যাব না। তবে অবশ্যই আমাদেরকে বাইরে যেতে হবে না। তাঁর সুন্নাহর মধ্যেই আমরা পেয়ে যাব সকল বিষয়ে উত্তম আদর্শ ও সমাধান। এ ধরনের একটি সংকল্পই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমানের দাবি। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন। (আমীন!)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলতে কী বুঝ ?

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'মুহাম্মাদ' শব্দের অর্থ হলো, প্রশংসিত। আর প্রশংসার অর্থ হচ্ছে-

الإخبار عن محاسن المحمود مع الحب له

অর্থাৎ- "কোন ব্যক্তিকে ভালবেসে তার গুণাবলীর সংবাদ দেয়া।"

আর রাসূল শব্দটি এসেছে ইরসাল (إرسال) থেকে। যার অর্থ-তাওজীহ (توجيه) বা কোন দিকে প্রেরণ করা অথবা এ শব্দটি এসেছে রাসালুন (رسل) থেকে। যার অর্থ-তাতাবু (تتابع) বা পর পর হতে থাকা। পর পর আসতে থাকা। যেমন- বলা হয়- جائت الإبل رسلا অর্থাৎ উটগুলো পর পর এসেছে।

উপরোক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর দুটো আভিধানিক অর্থ করা যায়।

১. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন।

২. هوالذى يتابع أخبار الله অর্থাৎ- মুহাম্মাদ এমন একজন ব্যক্তি যিনি আল্লাহর সংবাদগুলো একের পর এক পেতে থাকেন। (মুহাব্বাতুর রাসূল- ১৪)

এবার আমরা এ বাক্য দ্বারা শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে কী বুঝা যায় তা ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পাবো। (ইনশাআল্লাহ)

✪ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর অর্থ 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।' তবে নিম্নোক্ত চারটি ধারাবাহিক বাক্যে এর অর্থ সুন্দরভাবে ফুটে উঠে।

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা আদেশ করেছেন তা মেনে চলা।

২. তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন, তা বিশ্বাস করা।

৩. তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা।

৪. তিনি যা প্রবর্তন করেছেন, শুধু তা দিয়েই আল্লাহর ইবাদাত করা।

গভীরভাবে চিন্তা করলে কুরআনের একটি আয়াতেই এ অর্থগুলো এসে যায়। ইরশাদ হচ্ছে-

وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا – (سورة الحشر–٧)

অর্থাৎ- "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা পরিহার কর।

(সূরা ঃ আল হাশর- ৭)

✪ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর সংযোগ দ্বারা এ অর্থটিও বুঝা যায় যে, মুহাম্মাদ কেবলমাত্র আল্লাহর রাসূল তিনি ইলাহ নন। কেউ তাঁকে ইলাহ এর পর্যায়ে নিয়ে গেলে যুগপৎভাবে তা হবে আল্লাহর উলুহিয়্যাত ও রাসূলের রিসালাতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন।

✪ এ বাক্যাংশের অর্থ এভাবেও করা যায় যে, যেমনিভাবে ইবাদাতের একত্ব আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট তেমনিভাবে ইত্তেবা'অ তথা অনুসরণের একক মর্যাদা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট।

✪ যেমনিভাবে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে হিজরত করা অপরিহার্য তেমনিভাবে রাসূলের অনুসরণের দিকে হিজরত করা অপরিহার্য।

✪ এ বাক্য দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, গোটা সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পদমর্যাদার অধিকারী হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাইতো মহান আল্লাহ আপন নামের সাথে তাঁর নামটি যুক্ত করে তাঁকে উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলেন।

✪ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বাক্যটি পৃথিবী থেকে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আবার তা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশ্ন হল, কার মাধ্যমে এ পৃথিবীবাসী আবার এ কালিমাটি পেল ? উত্তর হল, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পেল।

✪ এ বাক্যের অর্থ এভাবেও করা যায় যে, জ্বীন ও মানবজাতির নিকটে আল্লাহর রিসালাত ও সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়াই হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর বাইরে কোন কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়নি। ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ إِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً – (سورة الجن–٢١)

অর্থাৎ- "বল ! আমি তোমাদের জন্য কোন কল্যাণ-অকল্যাণের অধিকারী নই।" (সূরা জ্বিন-২১)

✪ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহতে যেহেতু তাওহীদুল ইলুহিয়্যাহকে মুখ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তাই পরবর্তী বাক্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর অর্থ হবে রাসূল হিসেবে জ্বিন ও মানবজাতির নিকট তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এর দাওয়াত পৌঁছানোই হবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান ও মুখ্য দায়িত্ব। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীকে সর্বপ্রথম এ দাওয়াত দিয়েছিলেন যে, "হে মানব সকল ! তোমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ কর তবে সফল হতে পারবে।"

✪ এ বাক্য হতে আরো বুঝা যায় যে, যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তাই তাঁকে সাহায্য করা, তা'যীম, তাওক্বীর ও মর্যাদা দেয়া সমগ্র মানবজাতির উপর ফরজ বা অপরিহার্য কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ বাক্যাংশে যে ইদাফাত বা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে তা সম্মানসূচক। ইরশাদ হচ্ছে-

لِتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً –(سورة الفتح–٩)

অর্থাৎ- "যাতে তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর আর রাসূলকে সাহায্য কর, তাঁকে মর্যাদা দান কর আর যাতে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর সকাল-সন্ধ্যা।" (সূরা আল ফাতাহ-৯)

✪ আরো একটি অর্থ এভাবে করা যায় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জ্ঞান মানবজাতির নিকট নিয়ে এসেছেন, আক্বিদা-বিশ্বাসের প্রতি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন, যে পরিপূর্ণ জীবন-মরণ ব্যবস্থার প্রতি তাদেরকে ডাক দিয়েছেন তা তাঁর মানবিক প্রবৃত্তি, বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-গবেষণা ও সামাজিক পরিবেশ প্রতিবেশ থেকে আসেনি। বরং তা এসেছে সম্পূর্ণ আল্লাহর কাছ থেকে অহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। তাই বিবেক প্রসূত চিন্তা-চেতনা ও মানবিক সীমাবদ্ধ বিবেক দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য সমাজ নির্মাতা, সমাজ সংস্কারক ও নেতাদের সাথে তাঁকে তুলনা করা যায় না। তিনি তাদের অনেক অনেক উর্ধ্বে।

এ জন্যেই একজন খ্রিস্টান লেখক Michael H. Hart লিখিত The 100 এ তাঁকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে-

Mohammad (s.m) only the men in the history who was supremely successful on both religion and secular lives."

✪ মুহাম্মাদ শব্দটি তার বর্ণ বিন্যাস ও অর্থের মাধুর্যে একটি শ্রুতিমধুর ও মনোমুগ্ধকর প্রশংসিত ব্যক্তিত্বকে বুঝায়। আর রাসূলুল্লাহ বাক্যাংশটি তার অর্থের সুবিস্তীর্ণ পরিমণ্ডলে মানবীয় সকল মহৎ গুণকে শামিল করে নেয়। যাতে এ অর্থটি ফুটে উঠে যে, মুহাম্মাদ সকল উত্তম মানবিক গুণে ভূষিত। সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত, মায়া-মমতা, স্নেহ-আদরে মানবজাতির জন্য আপ্লুত। বীরত্ব ও বদান্যতায় অলংকৃত, যিনি রক্তের বাঁধন ছিন্ন করেন না। অসহায়কে বহন করেন, নিঃস্বের জন্যে উপার্জন করেন, আতিথেয়তায় যিনি অনন্য। সত্য পথে আগত সকল বিপদে যিনি মানুষের সাহায্য করেছেন। হৃদয়খানি যার সকল পুণ্যে পরিপূর্ণ। ইত্যাকার মহৎ গুণাবলীর আকর বানিয়েই আল্লাহ তাঁকে রিসালাতের অলংকারে অলংকৃত করেছেন। যাতে তিনি হতে পারেন সমগ্র মানবজাতির অনুসরণীয়, অনুকরণীয় উত্তম আদর্শ। ইরশাদ হচ্ছে-

اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه – (سورة الانعام–١٢٤)

অর্থাৎ- "আল্লাহ সম্যকভাবে জানেন তিনি কোন পাত্রে তার রিসালাত রাখবেন।"

(সূরা আল আন আম- ১২৪)

✪ আরো একটি অর্থ এভাবে করা যায়, যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তাই আল্লাহর জাত তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর নামসমূহ, তাঁর সুমহৎ গুণাবলী ও কার্যাবলি এবং তাঁর ন্যায় ও সত্য বিধি-বিধান সর্ম্পকে নির্ভূল ও সঠিকভাবে জানার একমাত্র মাধ্যম হলেন মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর বিধি-বিধান সম্পর্কে জানতে পারার দ্বিতীয় কোন তরিকাহ নেই। যে ব্যক্তি রাসূলের তরিকাহ বাদ দিয়ে আপন প্রবৃত্তি-প্রসূত কিংবা নব উদ্ভাবিত তরিকায় চলবে সে আল্লাহর ইবাদাত করল না। সে আত্ম-পূজা কিংবা গায়রুল্লাহর পূজা করল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মানব বংশোদ্ভূত না অন্য কিছু ঃ

সন্দেহাতীতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ ঃ

محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من كنانة وكنانة من العرب والعرب من ذرّيّة إسماعيل وإسماعيل من ذرّيّة إبراهيم و إبراهيم من نوح ونوح من أدم وأدم من تراب

অর্থাৎ- "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আব্দুল্লাহর পুত্র, তিনি ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র, তিনি হাশিমের পুত্র, হাশেম কুরাইশ বংশের, কুরাইশ কেনানা বংশের, কেননা আরব বংশোদ্ভূত, আরবগণ ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর, নূহ আলাইহিস সালাম আদম আলাইহিস সালামের বংশধর আর আদম আলাইহিস সালাম হলেন মাটির তৈরী। অতএব নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির তৈরী মানুষ।

সর্বোত্তম মানব বংশেই তাঁর জন্ম। মানব পিতা-মাতার মানব শিশু হিসেবেই তিনি দুনিয়াতে এসেছেন। মাটির তৈরী মানুষের জন্য মাটির তৈরী রাসূল প্রেরণই ছিল রাব্বুল আলামীনের চিরাচরিত সুন্নত। মানবজাতির জন্য প্রেরিত কোন রাসূলই মানবজাতির বাহির থেকে আসেন নি। এ হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী আক্বিদা। যার বিরোধিতা করা সুস্পষ্ট কুফর। ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلٰـهُكُمْ إِلٰـهٌ وَّاحِدٌ – (سورة الكهف–١١٠)

অর্থাৎ- "আপনি বলুন ! নিশ্চয় আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে অহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ মাত্র একজন।"

(সূরা কাহাফ- ১১০)

মাটির তৈরি মানুষ আল্লাহর একটি আয়াত বা তাঁর একটি নিদর্শন। মানুষ মাত্রই মাটির তৈরী। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ –(سورة الروم–٢٠)

অর্থাৎ- "তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন হল এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ।" (সূরা আর রূম- ২০)

যে জাতির কাছে রাসূল পাঠান হত, সে জাতির ভাষাই ছিল রাসূলের মাতৃভাষা। এর ব্যাত্যয় কখনো করা হয়নি। এতটুকুন বৈপরীত্য রাসূল ও তাঁর জাতির মধ্যে করা হয়নি। সেখানে কীভাবে মানব বংশের রাসূল অন্য কোন জাতির বংশোদ্ভূত হতে পারেন ? আল কুরআনের অপর একটি আয়াতে সকল রাসূলের মানবত্বকে মানবিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে সপ্রমাণিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْأَسْوَاقِ–

(سورة الفرقان–٢٠)

অর্থাৎ- "আপনার পূর্বে আমি যত রাসূলই প্রেরণ করেছি তারা সকলেই খাদ্য খেত এবং বাজারে চলাফেরা করত।"

(সূরা আল-ফুরকান- ২০)

রাসূলের হাতে যে সব অতি মানবীয় ও অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটত তা রাসূলের নিজস্ব শক্তিতে নয়। বরং সম্পূর্ণ আল্লাহর শক্তিতেই ঘটত।

ইরশাদ হচ্ছে-

وَقَالُوْا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللهِ – (سورة العنكبوت–٥٠)

অর্থাৎ- "তারা বলে, কেন তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে অলৌকিক নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় না? আপনি বলুন অলৌকিক নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহরই কাছে।"

(সূরা আনকাবুত- ৫০)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَّسُوْلاً – (سورة الاسراء–٩٣)

অর্থাৎ- "আপনি বলুন আমি আমার প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি তো একজন মানব-রসূল ব্যতীত আর কিছুই নই।"

(সূরা ইস্‌রা- ৯৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মজীবনী বা জীবনেতিহাস তাঁর মানব বংশোদ্ভূত হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জন্ম-মৃত্যু, খাদ্য-পানীয় গ্রহণ, বাজারে চলাফেরা, ক্রয়-বিক্রয়, স্বামীত্ব, পিতৃত্ব, যুদ্ধ-সন্ধি, ক্রোধ-অনুরাগ, আনন্দ-বিষাদ, ব্যাধি ও সুস্থতা এ সবই তো আর দশজন মানুষের মতো অক্ষরে অক্ষরে তাঁর জীবনে পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون (مسلم)

অর্থাৎ- "আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যেমন স্মরণে রাখ আমিও তেমনি স্মরণে রাখি, তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও তেমনি ভুলে যাই।"

(সহীহ মুসলিম)

বস্তুতপক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মানুষই ছিলেন না বরং সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। মানবিক সৃষ্টি ও চরিত্রে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। তাঁর মনুষ্যত্ব ও মানবত্ব ছিল অন্য সকলের চেয়ে বেশি। তাহলে যিনি সবার চেয়ে বেশি মানুষ, সবার চেয়ে পূর্ণ মানুষ তাকেই যদি আমরা বলি তিনি মানুষ নন তবে তা কত বড় তথ্য ও সত্য বিকৃতিতে পরিণত হয় তা কি আমরা ভেবে দেখেছি ? সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষই তো সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, সর্বাধিক প্রশংসনীয়। রাসূলের মানবীয় পরিচয়টি হরণ করলে এতে তো তাঁর মর্যাদাহানি হয়ে যায়। অথবা মানবিক মর্যাদার ঊর্ধ্বে তুলে ধরলে উলুহিয়্যাতের পর্যায়ে নিয়ে সে ক্ষেত্রেও তাঁকে অপমান করা হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق

منزلتي التي أنزلني الله عزّ وجلّ (مسند أحمد-٣/١٣٠)

অর্থাৎ- "আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর কসম ! আমি এটি ভালবাসি না যে, তোমরা আমাকে ঐ মর্যাদর ঊর্ধ্বে তুলে দাও। যে মর্যাদায় আল্লাহ আমাকে আসীন করেছেন।"

(মুসনাদে আহমাদ)

ওমর (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন-

عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله (البخارى)

অর্থাৎ- "খ্রিস্টান জাতি ইবনু মারইয়ামকে নিয়ে যেরূপ বাড়াবাড়ি করেছে তোমরা আমার প্রশংসা ও মর্যাদা দানে সেরূপ বাড়াবাড়ি করো না। আমি তো কেবল তাঁর বান্দাহ। তাই তোমরা শুধু এটুকু বলবে- "আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল।"

(সহীহ বুখারী)

সকল নবীগণই যে মানব বংশোদ্ভূত ছিলেন আল-কুরআনে ২২টি আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। আয়াতগুলো হলো-

✪ সূরা আলে ইমরান-৭৯ ✪ সূরা আল মায়েদা-১৮ ✪ সূরা আল আনআম-৯১ ✪ সূরা ইবরাহীম- ১০, ১১ ✪ সূরা আল কাহাফ-১১০ ✪ সূরা আম্বিয়া-৩ ✪ সূরা আল মুমিনুন ২৪, ৩৩ ✪ সূরা আশ-শুয়ারা- ১৫৪, ১৮৬ ✪ সূরা ইয়াসিন-১৫ ✪ সূরা ফুসসিলাত- ৬ ✪ সূরা শুরা-৫১ ✪ সূরা আত-তাগাবুন-৬, ✪ সূরা আল মুদ্দাস্‌সির-২৫, ✪ সূরা সূরা হুদ-২৭, ✪ সূরা আল-ইসরা-৯৩, ৯৪ ✪ সূরা আল-ক্বামার- ২৪ ✪ সূরা আল মুমিনুন- ৩৪,৪৭।

আল্লামা আব্দুর রাউফ মুহাম্মদ উসমান তাঁর 'মাহাব্বাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তেবা' ওয়াল ইবতেদা নামক গ্রন্থে এ ব্যাপারে ইজমা নকল করে বলেন-

إن من العقاءد الثابتة التى أكدها نصوص الشرع وأجمعت عليها الأمة أن رسل الله أجمعين بشر من جنس المرسل إليهم كما جرت بذالك سنة الله فى المرسلين قال تعالى "ولن تجد لسنة الله تبديلا" وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل بل كان بشرا مثلهم يوحى إليه (محبة الرسول ١٥٨)

অর্থাৎ- "এ আক্বিদা বিশ্বাস শরীয়ার বাণীসমূহ দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও যার উপর গোটা মুসলিম উম্মতের ইজমা তথা সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলগণ যে জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, তারা তাদেরই জাতিভুক্ত ছিলেন। রাসূলগণের ব্যাপারে এই হল আল্লাহর সুন্নাত। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً – (سورة الاحزاب-٦٢)

অর্থাৎ- "তুমি আল্লাহর সুন্নাতের কোন ব্যতিক্রম পাবে না।"

(সূরা আহযাব- ৬২)

(আমাদের) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নতুন রাসূল ছিলেন না বরং পূর্ববর্তী রাসূলগণের মতো তিনিও অহীপ্রাপ্ত মানুষই ছিলেন।"

উপরোক্ত আক্বিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বাড়াবাড়ির দরজা উন্মুক্ত করেছে শিয়া সম্প্রদায়। যারা রাসূলকে অনাদি, অতি মানব ও নূরের সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদের থেকে এ ভ্রান্ত আক্বিদাটি শিক্ষা গ্রহণ করেছে সুফী সম্প্রদায়। যারা হাকীকতে মুহাম্মাদীয়া কিংবা নূরে মুহাম্মাদীর প্রবক্তা। যারা এ মর্মে বানোয়াট হাদীস তৈরী করেছে যে, আল্লাহ সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁর নূর থেকে সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। কুরআনের কিছু কিছু আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হেদায়াতকারী ও সত্যপ্রকাশক হিসেবে নূর বলা হয়েছে। ভ্রান্ত সুফী মতবাদীরা সে আয়াত থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী বলে দলীল গ্রহণের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে-

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ – (سورة المائدة–١٥)

অর্থাৎ- "তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।"

(সূরা মায়েদা- ১৫)

এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যায় ইবনু জারির তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন-

قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل من الله نور يعنى بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذى أظهر الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استناربه يبين الحق

অর্থাৎ- "হে ইঞ্জিল ও তাওরাতের অধিকারীরা! তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। ইবনু জারির বলেছেন আয়াতে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা হককে প্রকাশ করেছেন, ইসলামকে বিজয়ী করেছেন, শিরক নিশ্চিহ্ন করেছেন। অতএব যে তাঁর থেকে হেদায়াতের আলো নিতে চায়, তিনি তাঁর জন্য নূরস্বরূপ। কেননা তিনি তার সামনে হক প্রকাশ করেন।"

একজন জ্ঞানবান পথের দিশাদানকারী ব্যক্তিকে নূর কিংবা আলোকবর্তিকা হিসেবে আখ্যায়িত করা একটি সাধারণ পরিভাষা। একজন জাহেলী কবি বলেন-

ألم ترا انا نور قوم وانما * يبين للناس في الظلماء نورها

অর্থাৎ- "তুমি কি দেখ না যে, আমরা সম্প্রদায়ের নূর বা আলোকবর্তিকা। আর অন্ধকারে আলোকবর্তিকাই তো মানবজাতিকে পথ দেখায়।"

এখানে নূর দ্বারা নূরের তৈরী হওয়া কিছুতেই উদ্দেশ্য নয়। বরং গোমরাহীর মুহূর্তে পথের দিশা দানের অর্থেই নূর বলা হয়েছে। অপর একজন কবি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের প্রশংসায় বলেন-

إذا سار عبد الله من مرو ليلة * فقد سار عنها نورها وجمالها

অর্থাৎ- "আব্দুল্লাহ যখন কোন রাতে মারভ শহর থেকে চলে যান, তখন এ শহর থেকে চলে যায় তার নূর ও রূপশ্রী।"

আমাদের পল্লীর কোন মহান জ্ঞানবান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে অতি সাধারণ কৃষকদের মুখেও বলতে শোনা যায় গ্রামে একটা বাতি ছিল আজ নিভে গেল। চারদিকে যেন আঁধার নেমে এল। উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা কিছুতেই তারা লোকটিকে নূরের তৈরী বলে বুঝায় না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেলায় নূরের তৈরীর অর্থটি গ্রহণ করা একটি বিকৃত অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু না।

তাছাড়া কে কোন জিনিষ থেকে তৈরী হয়েছে তার উপর মর্যাদা নির্ভর করে না। বরং তা নির্ভর করে ঈমান, আমল, কর্ম ও চরিত্রের উপর। আরো নির্ভর করে আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণার উপর। এ দুয়ের ভিত্তিতেই মানুষের মর্যাদা নিরূপণ করা হয়। আগুন, নূর কিংবা মাটির তৈরী হওয়ার উপর কোন মর্যাদাই নির্ভর করে না। এ ধরনের অবাস্তব দাবি করেই শয়তান অহংকারে পতিত হয়েছে অতঃপর তার মর্যাদার আসন থেকে বিতাড়নের সম্মুখীন হয়েছে। সর্বশেষ পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত বাস্তব সূত্র মতে মাটিসহ সকল পদার্থই ফোটন তথা আলোর কণিকা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আলো বা এনার্জির ঘনায়িত রূপই হচ্ছে পদার্থ। অতএব মাটিও নূরের তৈরী এবং সে বিচারে পরোক্ষভাবে গোটা মানবজাতি নূরের তৈরী। এ ক্ষেত্রে কারোরই আর কোন বিশেষত্ব বজায় থাকে না। তাই রাসূলের নূরের তৈরী হওয়া নিয়ে বিবাদ করা নিরর্থক।

ইবাদত সঠিক হওয়ার শর্তাবলী

ইবাদাত কবুল হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে।

১. ঈমান। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ – (سورة الماءدة–٥)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি ঈমানকে অস্বীকার করবে তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা আল মায়েদা-৫)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولـئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ – (سورة المؤمن–٤٠)

অর্থাৎ- "যে নর বা নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎ কাজ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে যেথায় তাদেরকে জীবিকা দেয়া হবে বিনা হিসাবে।"

(সূরা আল মুমিন-৪০)

২. ইখলাস তথা নিয়্যাতকে আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করে নেয়া ও গায়রুল্লাহ থেকে নিয়্যাতকে পবিত্র করে ইবাদাতটুকু শুধু আল্লাহকে নিবেদন করা এবং তাঁরই সামনে বিনয় প্রকাশ করা যাতে সমস্ত ইবাদাত আল্লাহরই জন্য সাব্যস্ত হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ – (سورة الانعام–١٦٢)

অর্থাৎ- "নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সমগ্র জাহানের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।"

(সূরা আনআম-১৬২)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَآ أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ– (سورة البينة–٥)

অর্থাৎ- "তাদেরকে তো শুধু আদেশ করা হয়েছে একত্ববাদী হয়ে ইবাদাতকে আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্যে।"

(সূরা বাইয়্যেনা- ৫)

৩. সুন্নাতের অনুসরণ। ইরশাদ হচ্ছে-

مَآ آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا – (سورة الحشر–٧)

অর্থাৎ- "রাসূল তোমাদেরকে যা দান করেন তা গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেন তা পরিহার কর।"

(সূরা হাশর-৭)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ– (سورة ال عمران–٣١)

অর্থাৎ- "বল ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" (সূরা আলে ইমরান-৩১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ (بــخارى)

অর্থাৎ- "যে আমাদের এ দ্বীনের বিষয়ে এমন কিছু উদ্ভাবন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তবে তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী)

আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ আন-নাবাজী বলেন পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা আমল তথা ইবাদাত পূর্ণতা লাভ করে। বিষয় পাঁচটি হলো ঃ

❋ ঈমান ❋ হকের জ্ঞান লাভ ❋ আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য ইখলাস ❋ সুন্নতের উপর আমল ❋ হালাল খাবার গ্রহণ।

উপরোক্ত পাঁচটির কোন একটি হারিয়ে গেলে ইবাদাত কবুল হবে না। কেননা তুমি যদি শুধু আল্লাহকে চেনো কিন্তু হক না জান তবে উপকৃত হবে না। আর যদি শুধু হককে জান আল্লাহকে না জান তবুও উপকৃত হবে না। আর যদি আল্লাহকে ও হককে জানলে অথচ আমলকে আল্লাহর জন্যে খালেস করলে না তবুও উপকৃত হবে না। আর যদি আল্লাহকে ও হককে জানলে এবং আমলও খালেস করলে অথচ সুন্নাতের উপর হলো না তবুও উপকৃত হতে পারবে না। আর যদি এ চারটি পরিপূর্ণ হয় অথচ খাদ্য হালাল হলো না তবুও উপকৃত হতে পারবে না।

(জামেউল উলুমে ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা নং-২৬৩)

ইবাদাত যেহেতু ঈমানদাররাই করে থাকেন এ জন্যে ওলামাদের অনেকেই ইবাদাতের শর্তের মধ্যে ইখলাস ও সুন্নাতের অনুসরণ করাকেই উল্লেখ করে থাকেন। অর্থাৎ তাদের কথায় ইবাদাত কবুলের দুটো শর্তই প্রমাণিত হয়।

সংক্ষিপ্ত
প্রশ্ন ও উত্তর

প্রথম পর্ব

১. ইসলামের ইবাদাতসমূহ তাওক্বিফিয়্যাহ (কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত) **নয়।**

উত্তর ঃ ☒

কথাটি সঠিক নয়। বরং সকল ইবাদাতই তাওক্বিফিয়্যাহ তথা শুধুমাত্র কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত। কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে কোন ইবাদাতই গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ

অর্থাৎ- "যে আমাদের এ দ্বীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা এর অন্তর্ভূক্ত নয় তবে তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী ও মুসলিম)

বুঝা গেল নব উদ্ভাবিত সকল ইবাদাতই ইসলামবহির্ভূত এবং আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ কিছুতেই ঐ ইবাদাত গ্রহণ করবেন না যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি।

২. একমাত্র আল্লাহই গায়িব জানেন, অন্য কেউ গায়িব জানে এ বিশ্বাস করা কুফর।

উত্তর ঃ ☑

কথাটি সঠিক। আল্লাহ বলেন-

قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ – (سورة النمل-٦٥)

অর্থাৎ- "বল ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ গায়েব জানে না।"

(সূরা নামল-৬৫)

৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করা বৈধ নয়।

উত্তর ঃ ☑

কথাটি সঠিক আল্লাহ বলেন-

أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ – (سورة يوسف–٤٠)

অর্থাৎ- "তিনি (আল্লাহ) নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত না করো।

(সূরা ইউসুফ- ৪০)

৪. রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) মিলাদের মাহফিলে উপস্থিত হন।

উত্তর ঃ ☒

মিলাদ একটি বিদয়াত বা কুসংস্কার। এটি ইসলাম বহির্ভূত। বাড়াবাড়িমূলক নতুন ইবাদাত। যা ৬০৪ হিজরীতে ইরাকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। মৌলিক বিদয়াতসমূহের সুতিকাগার হল ইরাক। খ্রিস্টান সম্প্রদায় ঈসা আলাইহিস সালামের মিলাদ পালন করে থাকে। ইংরেজি সনকে আরবীতে মিলাদী সন বলা হয়। কেননা ঈসা আলাইহিস সালামের মিলাদ তথা জন্মদিন থেকে এ সনের গণনা শুরু হয়েছে। মুসলিম সমাজে এ কুসংস্কার খ্রিস্টান সমাজ থেকে অনুপ্রবেশ করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো সালাত ও সালাম তথা দরূদকে ত্যাগ করে তদস্থলে এ কুসংস্কারটি আবিষ্কার করা হয়েছে। খ্রিস্টান সম্প্রদায় ঈসা আলাইহিস সালামকে সম্মান করতে গিয়ে তাওহীদের সীমানা লঙ্ঘন করেছে। নবীকে তারা বানিয়েছে ইলাহ ও মা'বুদ। অতিভক্তির এটাই কুফল। মিলাদ অনুষ্ঠানটিতে আল্লাহর চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা দেয়া হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। খ্রিস্টানদের মতই অতি ভক্তি প্রদর্শন করা হয় তাঁর প্রতি। অথচ তিনি কঠোরভাবে এ অতিভক্তি থেকে নিষেধ করে গেছেন- "তোমরা আমাকে নিয়ে তেমন বাড়াবাড়ি করো না যেমনি বাড়াবাড়ি করেছিল খ্রিস্টানরা মাসীহ ইবনু মারইয়ামকে নিয়ে।"(বুখারী) মিলাদপন্থীরা এ নিষিদ্ধ বাড়াবাড়িটাই করছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রত্যেক সালাতে সালাত ও সালাম প্রেরণ করা হয়। যখনই কোথাও তাঁর নাম উচ্চারিত হয় মুসলিম মাত্রই তাঁর জন্য পাঠ করে সালাত ও সালাম। প্রতিটি হাদীস পড়ার সময় তাঁর জন্য প্রেরণ করা হয় দরূদ ও সালাম। সকাল-সন্ধ্যায়, জুময়ার দিনে শত কোটি মুসলমান তাঁর জন্য দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে থাকে।

খ্রিস্টানদের অনুসরণে মিলাদ নামে আল্লাহকে বাদ দিয়ে নবীর ইবাদাত যারা করছে তারা নবীর সম্মান করছে না বরং নবীর আদর্শের সাথে শত্রুতা পোষণ করছে। সকল বিদয়াতই শয়তানের আবিষ্কার। সেই এর আহ্বায়ক। মিলাদ মাহফিলে কে হাজির হয় তা দলিল দিয়েই সাব্যস্ত করতে হবে। দলিল যার পক্ষে থাকবে তার কথাটিই সত্য বলে বিবেচিত হবে। মিলাদ মাহফিলে অদৃশ্যভাবে কে উপস্থিত হয় তার দলিল আমরা পেশ করছি।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

عن عبد الله قال خط رسول الله خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما قال خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل

(أحمد، مشكاة)

অর্থাৎ- "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে মাটিতে একটি রেখা টানলেন। অতঃপর বললেন, এটি আল্লাহর সরল সহজ পথ। ইবনু মাসউদ বলেন, অতঃপর তিনি উক্ত রেখার ডানে ও বামে আরও রেখা টানলেন অত:পর বললেন এসব রেখা ও পথের (বিদয়াতসমূহ) প্রতিটির মধ্যেই এগুলোর প্রতি আহ্বানকারী একটা শয়তান বিদ্যমান রয়েছে। তারপর তিনি এ আয়াত আবৃত্তি করলেন। "আর একটি (ইসলাম) আমার সরল পথ, তোমরা এর অনুসরণ কর আর বিভিন্ন পথের (বিদয়াত, কুসংস্কার) অনুসরণ করো না।"

(আহমাদ, মিশকাত)

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, প্রতিটি বিদয়াতের জন্য একটা আহ্বায়ক শয়তান রয়েছে। বিদয়াতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা, বিদয়াতকে মানুষের অন্তরে সুশোভিত করা তার কাজ। যেখানেই কোন বিদয়াত হয় সেখানেই এ সব কাজ ভালভাবে করানো এবং নিজে তা উপভোগ করার জন্য উপস্থিত হয়। অতএব মিলাদ মাহফিলে কে উপস্থিত হয় উক্ত হাদীসের আলোকে তা বিচার করার দায়িত্ব পাঠকবৃন্দের উপর ন্যস্ত থাকল।

৫. পরকালের মুক্তির জন্য মুর্শিদ ধরা শর্ত।

উত্তর ঃ ☒

বাংলাদেশের মানুষ মুর্শিদ ধরা বলতে যা বুঝে সে অর্থে পরকালের মুক্তির জন্য নয় বরং পরকাল ধ্বংসের জন্য মুর্শিদ ধরা শর্ত। কেননা যাকে পীর বা মুর্শিদ হিসাবে গ্রহণ করা হয় তিনি একজন মা'বুদ আর মুরিদ হয় তার বান্দা। পীর বা মুর্শিদ ধরা হয় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, তাওবাহ কবুল ও মাগফেরাত প্রাপ্তির মধ্যস্থ হিসেবে। পীরদের প্রধান তথা কুতুবের হাতে থাকে দিওয়ানুস সালেহীন বা পুণ্যবান ওলী আউলিয়ার দপ্তর। তিনি সন্তুষ্ট হলে কাউকে ওলী বানিয়ে দিতে পারেন আবার অসন্তুষ্ট হলে আউলিয়াদের দপ্তর থেকে কারও নাম খারিজ করে দিতে পারেন। এ ধরনের মধ্যস্থ গ্রহণই হলো মুর্তিপূজারী ও ইহুদী নাসারাদের কুফরের মূল নীতি ও ভিত্তি। মুরিদের জন্য শর্ত হল পীরের কোন কাজেই সে প্রশ্ন করতে পারবে না অথচ এ অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর অধিকার যাকে দেয়া হল সে তো বাতিল মা'বুদে পরিণত হল।

আল্লাহ বলেন-

لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ – (سورة الانبياء–٢٣)

অর্থাৎ- "তিনি (আল্লাহ) যা করেন তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।"

(সূরা আল আম্বিয়া- ২৩)

পীরগণ মুরিদদেরকে তালক্বীন করে থাকেন– আমার ক্বলব পীরের ক্বলবের দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হয়েছে। এভাবে পীরের পর পীরের ক্বলব হয়ে তারা আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হয়। পীরদের ক্বলবগুলো আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হওয়ার ভায়া বা মধ্যস্থ হিসেবে ব্যবহৃত হল। অর্থাৎ পীরগণ মুরিদ ও আল্লাহর মাঝে মাধ্যম হয়ে মুরিদকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায়। তাদের মাধ্যম ব্যতীত মুরিদের আল্লাহকে পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এটাই হল আরবের মুশরিক সম্প্রদায়সহ মুশরিকদের শিরকের মর্মকথা। তাদের কথা কুরআনে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে-

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللهِ زُلْفَى – (سورة الزمر–٣)

অর্থাৎ- "আমরা (মূর্তিপূজারী) তাদের ইবাদাত এজন্যই করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।"

(সূরা যুমার- ৩)

পীরের ক্বলবের দিকে মুতায়াজ্জিহ হওয়া নি:সন্দেহে শিরকে আকবার যা থেকে তওবা করে এহেন পীরকে বর্জনপূর্বক আল্লাহর তাওহীদে ফিরে না এলে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। যার পরিণাম চির জাহান্নাম।

পীরের ক্বলব বা কোন রূপ মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হওয়া ফরজ। আল্লাহ বলেন-

إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

(سورة الانعام-٧٩)

অর্থাৎ- "আমি একত্ববাদী হয়ে স্বীয় আনন, অন্তর ও গোটা অস্তিত্বকে ঐ সত্তার দিকে মুতাওয়াজ্জিহ করছি যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

(সূরা আনআম- ৭৯)

বুঝা গেল মুতাওয়াজ্জিহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন মধ্যস্থ কাউকে গ্রহণ করাই হল মূল শিরক।

৬. তাবাররুক নেয়া শরীয়তে দলিলাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ।

উত্তর ঃ ☑

তাবাররুক গ্রহণ করার পক্ষে শরীয়ার দলিল না থাকলে তাবাররুক গ্রহণ বৈধ নয়। সবচেয়ে বরকতময় হলো আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ। এগুলো উচ্চারণ ও এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহকে ডেকে তাবাররুক নেয়া যেতে পারে। আল্লাহ বলেন-

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ – (سورة الرحمن-٧٨)

অর্থাৎ- "কত বরকতময় আপনার পালনকর্তার নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।

(সূরা আর রাহমান- ৭৮)

আরো বরকত নেয়া যেতে পারে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের অনুসরণ করে। আল্লাহ বলেন-

وَهـٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ – (سورة الانعام-١٥٥)

অর্থাৎ- "এটি এমন একটি গ্রন্থ আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব বরকতময়, অতএব এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর- যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।"

(সূরা আনআম- ১৫৫)

বস্তুত কুরআনের বরকতময় হওয়ার অর্থ হলো গোটা ইসলামের বরকতময় হওয়া। কেননা ইসলাম ও কুরআন সমার্থবোধক। অতএব ইসলামের ফরজ নফল সকল কাজে রয়েছে বরকত। ইসলামের যে কোন বিধান পালন করেই তাবাররুক হাসিল করা যেতে পারে।

আরো তাবাররুক নেয়া যেতে পারে বাইতুল্লাহ, মসজিদে নববী, বাইতুল মুকাদ্দাস হতে। যেগুলোতে সালাত পড়লে বিপুল সওয়াব পাওয়া যায়।

বাইতুল্লাহর বরকত সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন-

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ - (سورة ال عمران-٩٦)

অর্থাৎ- "মানব জাতির জন্য প্রথম যে ঘর নির্মিত হয়েছিল, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় (মক্কা) অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়াত ও বরকতময়।

(সূরা আলে ইমরান- ৯৬)

লাইলাতুল কদরকেও আল্লাহ বরকতময় রাত বলেছেন। সে রাতে ইবাদাতের মাধ্যমে তার বিশেষ বরকত অর্জন করা যেতে পারে।

কোন স্থানের মাটি, সুগন্ধি, সেখানে রাখা কোন বস্তু তাবাররুক হিসেবে নেয়া যাবে না। কোন ব্যক্তির অযুর পানি, খাদ্যের উচ্ছিষ্ট, জামা-কাপড়, লাঠি, তসবীহ, লোটা-বদনা ইত্যাদি তাবাররুক হিসেবে নেয়া যাবে না। আল এ'তেসাম গ্রন্থকার বলেন-

ثبت عن الصحابة أنهم تبركوا بالتمسح بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم والتدلك بنخامته بل إن منهم من شرب دم حجامته صلى الله عليه وسلم ولكن لم يرد أنهم فعلوا نحو ذالك مع غيره صلى الله عليه وسلم من خلفائه الراشدين وأهل بيته الطاهرين فيكون هذا الضرب من التبرك مقصورا على ذاته الشريفة منقطعا بموته

অর্থাৎ- "এটা প্রমাণিত যে, সাহাবাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অযুর উচ্ছিষ্ট বরকতের বস্তু হিসেবে কাড়াকাড়ি করে গ্রহণ করতেন। তাঁর শ্লেষ্মা গায়ে মাখতেন। বরং কেউতো তাঁর সিংগার রক্ত পান করেছেন। কিন্তু এ ধরনের বরকত নেয়ার মত কোন আচরণ তারা তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন কিংবা পবিত্র বংশধরগণের কারো সাথে করেছেন এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া

যায়নি। অতএব তাবাররুক গ্রহনের এ প্রকারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তার সাথে সীমবদ্ধ। তাঁর মৃত্যু দ্বারা তাবাররুক গ্রহনের এ প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে গেছে।

(আল এ'তেসাম- ২/৬-৯)

আশ্ শিরক ওয়া মাজাহিরুহু গ্রন্থে ১০৩ পৃষ্ঠায় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাবাররুকের জন্য চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

১. শরীয়া সম্মত কোন কাজ করে বরকতের আশা করা। যেমন ঃ সালাত পড়া, আল্লাহর আছে দুআ করা।
২. তাবাররুক গ্রহণকারী অপরকে তাবাররুকের জন্য উৎসাহিত করবে না, আহ্বান করবে না, এমন কোন জিনিস রাখবে না যা থেকে সাধারণ মানুষ তাবাররুক নেয়ার জন্য আসবে।
৩. তাবাররুকের উদ্দেশ্যে সফর করবে না।
৪. নিজের দ্বীন তথা তওহীদ শিরক সম্পর্কে তাকে সচেতন ব্যক্তি হতে হবে।

৭. গুণাহের কাজে মান্নতকৃত নজর পুরা করতে হয় না।

উত্তর ঃ ☑

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (بخارى أصحاب السنن)

যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মান্নত করল সে যাতে আল্লাহর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি (গুনাহের কাজ) করার মান্নত করল সে যাতে আল্লাহর নাফরমানি না করে। (বুখারী, আসহাবুস্ সুনান)

অর্থাৎ গুনাহের কাজে মান্নত করলে তা পালন করা নিষিদ্ধ। পালন না করার জন্য তাকে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না।

৮. স্রষ্টার অবাধ্যতা করেও সৃষ্টির আনুগত্য করা যায়।

উত্তর ঃ ☒

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (بخارى)

অর্থাৎ- "স্রষ্টার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।" (বুখারী)

আল্লাহ বলেন-

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا – (سورة لقمان–١٥)

অর্থাৎ- "পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে যার জ্ঞান তোমার নেই ; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না।

(সূরা ঃ লুকমান- ১৫)

৯. সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ কিয়ামত অবধি কার্যকরি নয়।

উত্তর ঃ ☒

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينـــزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة (مسلم١/٨٧)

অর্থাৎ- "আমার উম্মতের একটি দল বিজয়ী বেশে লড়াই করতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। তিনি বলেন- অতঃপর অবতীর্ণ হবে ঈসা ইবনু মারইয়াম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাদের আমীর বলবেন- আসুন সালাতে আমাদের ইমামত করুন। তিনি বলবেন, না। তোমরা একে অপরের আমীর। এটা এ ইম্মতের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মানস্বরূপ। (মুসলিম- ১/৮৭)

প্রকাশ থাকে যে, লড়াই হল আদেশ-নিষেধের চূড়ান্ত রূপ। আদেশ-নিষেধ অমান্য করলে অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। বুঝা গেল কিয়ামত পর্যন্ত আদেশ-নিষেধ তো থাকবেই এমনকি তা চূড়ান্ত রূপ লড়াইও বিদ্যমান থাকবে। বিশুদ্ধ হাদীস অনুসারে এ যুদ্ধ শেষ হবে ঈসা আলাইহিস্ সালামের নেতৃত্বে দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে।

১০. ইসলামী আইন বিংশ শতাব্দীর উপযোগী নয়, এ উক্তি ধর্মের উপর আঘাত নয়।

উত্তর ঃ ☒

ইসলামী আইন সকল যুগের জন্য সমভাবে উপযোগী করেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নাযিল করেছেন। ইসলামী আইন বিংশ শতাব্দীর উপযোগী নয় এ কথা বলার অর্থ হল সর্বজ্ঞ আল্লাহকে অজ্ঞতার দোষ দেয়া যা সরাসরি কুফর। আল্লাহ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমভাবেই জানেন। বিংশ শতাব্দী সম্পর্কে, এর সমস্যাবলী সম্পর্কে অনাদিকাল থেকেই তিনি জ্ঞাত। অতএব তিনি যে আইন দিয়েছেন তা বিংশ শতাব্দী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সম্পূর্ণ উপযোগী। বরং দিন যত যাবে ততই এর উপযোগিতা বাড়বে। আল্লাহ বলেন-

سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِى الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ – (سورة حم السجدة–٥٣)

অর্থাৎ- "আমি বিশ্বজগত ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব; ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা'ই সত্য।

(সূরা হা মিম আস্ সাজদাহ- ৫৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

لعل أخرها أن يكون أعرضها عرضا وأعمقها عمقا وأحسنها حسنا

(رزين، مشكاة–٥٨٣)

অর্থাৎ- "এ উম্মতের সর্বশেষ অনুসারী দল হতে পারে আরও অধিক বিস্তৃত। আরও অধিক গভীর। আরও অধিক সুন্দর। (রাযীন, মিশকাত- ৫৮৩)

১১. ইসলাম মেয়েদেরকে মিরাসে পুরুষদের অর্ধেক অংশ দিয়ে, পর্দা মেনে চলতে নির্দেশ দিয়ে, মেয়েদের প্রতি অবিচার করেছে।

উত্তর ঃ ☒

আল্লাহ তা'য়ালা কারো প্রতি অবিচার করেন না। মেয়েদেরকে সম্পদের যে অংশ দেয়া হয়েছে পরিণামের বিচারে তা ছেলেদের চেয়েও বেশি।

কেননা ঃ ১. মেয়ে পিতা-মাতাকে পোষণ করে না। পক্ষান্তরে ছেলে দায়িত্ব হিসাবে তাদের উভয়কে পোষণ করে।

২. মেয়ে তার স্বামীর কাছে মোহ্রানা, ভরণ-পোষণসহ সকল সুবিধা লাভ করে। ফলে মিরাসসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ তার কাছে থেকে যায়। পক্ষান্তরে ছেলেকে তার স্ত্রীর মোহ্রানা, ভরণ-পোষণ সহ সব কিছু দিতে হয়। ফলে তার সম্পদ ব্যয় হয়ে যায়।

৩. মেয়ের শ্বশুরালয়ের আত্মীয়-স্বজন, তার স্বামী, ছেলে মেয়ে সকলেরই মেহমানদারি করতে হয় ছেলেকে। পক্ষান্তরে মেয়েকে এর কিছুই করতে হয় না। ফলে ছেলের সম্পদ শেষ হয়ে যায় আর মেয়ের সম্পদ তার কাছে থেকে যায়।

সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহ মেয়েদের উপর জুলুম করেননি বরং ফলাফলের বিচারে আল্লাহ তাদেরকে বেশি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً – (سورة الكهف–٤٩)

অর্থাৎ- "তোমার প্রতিপালক কারো উপর জুলুম করেন না।"

(সূরা কাহাফ- ৪৯)

ছেলেদের সম্পদ বন্টনের বিচারে বেশি আর মেয়েদের সম্পদ পরিণামের বিচারে অধিক। অতএব উভয়েই সমান। কারো উপর জুলুম করা হয়নি।

আর থাকলো পর্দার কথা। সেতো জুলুম নয় বরং জুলুম থেকে বাঁচার উপায়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

(سورة الاحزاب–٥٩)

অর্থাৎ- "হে নবী ! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণ এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে (তারা যে সৎচরিত্রা ও সম্ভ্রান্ত তা বুঝা যাবে)। ফলে তাদেরকে নির্যাতন করা হবে না।

(সূরা আহযাব- ৫৯)

বুঝা গেল পর্দার মাধ্যমে বিশ্বময় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা সম্ভব। নারীকে পর্দাহীন করার অর্থ হল তাকে নির্যাতনের মুখে ঠেলে দেয়া। অতএব পর্দা নারীর প্রতি জুলুম নয় বরং পদাহীনতাই নারীর প্রতি জুলুম।

১২. দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ সন্ত্রাসেরই নামান্তর, ইসলামের প্রাথমিক যুগে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভের উদ্দশ্যেই জিহাদ করা হত।

উত্তর ঃ ☒

সন্ত্রাস মানে কারো অন্তরে ভীতি সঞ্চার করা। অপরাধের কারণে মানুষের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে ভীতি সঞ্চারিত হয়। কাফের, মুশরিকের অন্তরে অসময়ে কাক, পেঁচার ডাক শুনলেও ভীতির সঞ্চার হয়। এ ভীতি সঞ্চারিত হওয়ার জন্য তার শিরক ও অপরাধই দায়ী, আল্লাহ দায়ী নন। ন্যায়বিচারককে অপরাধীরা সব সময়ই ভয় পায়। এজন্য কি বিচারক দায়ী ? ইসলামী জিহাদকে তারাই ভয় পায় যারা পাপিষ্ট, অপরাধী ও মুশরিক। কারণ ইসলামী জিহাদ অপরাধীকে ইনসাফের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। তার অপরাধ ও জুলুমের পথ রুদ্ধ করে দেয়। আল্লাহর দুশমনরাই আল্লাহর বাহিনীকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়। আল্লাহর বন্ধু ও পুন্যাত্মা মানুষেরা ইসলামী জিহাদকে কখনো ভয় পায় না। কারণ তারা জানে এ জিহাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, এ জিহাদ পাপাচারের বিরুদ্ধে, ন্যায় ও পূন্যের বিরুদ্ধে নয়। ইসলামী জিহাদ সন্ত্রাস তো নয়ই বরং সন্ত্রাস নির্মূলের মহৌষধ। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সন্ত্রাস ও ফিতনা ফাসাদ দূর করার মোক্ষম উপায়। আল্লাহ বলেন-

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّه لِلّٰهِ – (سورة البقرة–١٩٣)

অর্থাৎ- "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা বিপর্যয় দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়।

(সূরা বাকারা- ১৯৩)

যারা ইসলামী জিহাদকে সন্ত্রাস বলে তারা আল্লাহর তাওহীদ বিরোধী, তাঁর দ্বীনের ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ বিরোধী। ইসলামী জিহাদকে সন্ত্রাস বলা একটি মস্ত বড় তথ্য সন্ত্রাস। ফেরআউন বনী ইরসাইলের সত্তর হাজার শিশুকে খুন করেছিল এক মুসা আলাইহিস সালামের ভয়ে। সে নিজে জালিম না হলে মূসা আলাইহিস সালামকে কখনো ভয় পেতো না, সন্ত্রস্ত হতো না তাঁর আবির্ভাবের সংবাদে। তার সন্ত্রস্ত হওয়ার জন্য মুসা আলাইহিস সালাম দায়ী নয়, সে নিজেই দায়ী। জিহাদের উদ্দেশ্য কী ? যিনি ফরজ করেছেন তাঁর কাছেই জানতে হবে। সূরা বাকারার উপরোল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ জিহাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তা হল ফিতনা বিপর্যয় ও সন্ত্রাস দূরিভূত করে আল্লাহর দ্বীন তথা তাওহীদ ও ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করা। দুনিয়ার সম্পদের লোভে জিহাদ করা হয় না। জিহাদের পথে দুনিয়ার সমৃদ্ধি অতিরিক্ত হিসেবেই আল্লাহ দান করেন। জিহাদের মূল লক্ষ্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন অতঃপর জান্নাত প্রাপ্তি।

১৩. সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম নিষ্পাপ। জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের আযাব, মিযান, পুলসিরাত, হাশর ইত্যাদি সঠিক।

উত্তর ঃ ☑

নবীগণ আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। তাই তারা যাবতীয় পাপাচার থেকে সংরক্ষিত। আল্লাহ বলেন-

اَللّٰهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ – (سورة الحج–٧٥)

অর্থাৎ- "আল্লাহ মালায়িকাদের (ফেরেশতা) মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষদের মধ্য হতেও।"

(সূরা আল হাজ্জ-৭৫)

এ থেকে বুঝা গেল নবীগণ আল্লাহর মনোনীত। আল্লাহ আরো বলেন-

كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ – (سورة يوسف–٢٤)

অর্থাৎ- "তাঁকে (ইউসফ আলাইহিস সালাম) মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে (নিদর্শন) দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

(সূরা ইউসুফ-২৪)

এ থেকে বুঝা গেল নবীগণ পাপাচার ও মন্দ কর্ম থেকে সংরক্ষিত।

জান্নাত সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন-

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ اَنْ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ

(سورة البقرة–٢٥)

অর্থাৎ- "যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে।

(সূরা বাকারা- ২৫)

জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا

(سورة البينة–٦)

অর্থাৎ- "আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের (রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনি) তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে।

(সূরা ঃ বায়্যিনা- ৬)

কবর আযাব সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন-

النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَّيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

(سورة المؤمن–٤٦–٤٧)

অর্থাৎ- "সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে (ফেরআউন গোত্র) আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরআউন গোত্রকে কঠিনতম আযাবে দাখিল কর।

(সূরা মুমিন - ৪৬ ও ৪৭)

সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে পেশ করার দ্বারা কবর আযাব বুঝানো হয়েছে। মিযান তথা পাপ পূণ্য পরিমাপ করার পাল্লা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ – (سورة الانبياء–٤٧)

অর্থাৎ- "আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব।"

(সূরা আম্বিয়া- ৪৭)

পুলসিরাত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهرَانَيْ جَهَنَّمَ (مسلم–١/١٠٠)

অর্থাৎ- "পুলসিরাত স্থাপন করা হবে জাহান্নামের উপর। (মুসলিম- ১/১০০)

হাশর তথা কিয়ামতের মাঠে সমবেতকরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ – (سورة ق–٤٤)

অর্থাৎ- "যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটোছুটি করে বের হয়ে আসবে। এটা এমন হাশর যা আমার জন্য অতি সহজ।

(সূরা ক্বাফ- ৪৪)

১৪. রোমান ইংলিশ আইনসহ মানব রচিত আইন আল্লাহর আইনের চেয়ে উত্তম।

উত্তর ঃ

অর্থাৎ- "তারা কি জাহেলিয়্যাত আমলের আইন বিধান কামনা করে ? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম বিধানদাতা কে আছে ?"

(সূরা মায়েদা- ৫০)

এ থেকে বুঝা গেল রোমান ইংলিশ আইন সহ মানব রচিত সকল আইন জাহেলিয়্যাতের নিকৃষ্ট আইন। আল্লাহর প্রাজ্ঞ আইনের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে দূরের কথা তার সমানও হতে পারে না। বরং তা জাহেলিয়্যাত বা অজ্ঞতা।

১৫. তাওহীদের দাওয়াত দানকারী মাজার ও কবর পূজাকে অস্বীকারকারীগণ ইসলামী ঐক্যে ফাটল সৃষ্টিকারী দল বিশেষ। এ উক্তিটি সঠিক আক্বিদা-বিশ্বাসকে নিয়ে হাসি-তামাশারই নামান্তর।

উত্তর ঃ ☑

মাজার ও কবর পূজারীরা মুসলমানই নয়। তাদের ইসলাম থাকলেই তো ঐক্যে ফাটল ধরার প্রশ্ন আসত। তাওহীদের দাওয়াত, মাজার ও কবর পূজা নামক শিরক অস্বীকার করা সকল মুসলিমের উপর ফরজ। মুসলিম সমাজে যতদিন তাওহীদের দাওয়াত থাকবে এবং থাকবে শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ততদিন এ জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকবে। কেননা তাওহীদ ঐক্য সৃষ্টিকারী আর কবর ও মাজার পূজাসহ সকল শিরক ঐক্য বিনষ্টকারী। আল্লাহ বলেন-

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

(سورة ال عمران-١٠٣)

অর্থাৎ- "তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের (তাওহীদ ও দ্বীন) কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ।"

(সূরা আলে ইমরান- ১০৩)

এ থেকে বুঝা গেল শিরকে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মানুষ একে অপরের শত্রু থাকে। আর তাওহীদী জীবন বিধানের মাধ্যমে মানুষ হয়ে যায় ভাই ভাই।

অতএব তাওহীদের দাওয়াত, কবর ও মাজার পূজা অস্বীকার কারী দল ইসলামী ঐক্যে ফাটল সৃষ্টিকারী এ কথাটি যথার্থ নয়। বরং বিশুদ্ধ আক্বিদা-বিশ্বাসের সাথে বিদ্রূপ করার শামিল।

১৬. বালা-মুসিবত, চোখের অনিষ্টতা, রোগ-শোক থেকে রক্ষা পাবার নিমিত্তে কড়ি-কাঠি, তাগা, তাবিজ, বৃক্ষের জড়মূল, পাথরাদি এ বিশ্বাসে ঝুলানো যে এগুলো নিজ গুণে তাকে রক্ষা করবে। এসব কার্যাদি শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

উত্তর ঃ ☑

উপরোক্ত বস্তুগুলো ব্যবহার করা শিরক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (مسند أحمد، حاكم)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দেবেন না। আর যে কড়ি ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না।"

(মুসনাদে আহমাদ, হাকেম) হাদীসটি বিশুদ্ধ।

তিনি আরো বলেন-

من علق تميمة فقد أشرك (رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করল সে শিরক করল। (আহমাদ ত্ববরানী)

আহমাদের রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-

من علق شيئا وكل إليه (رواه الطبراني)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি শরীরে কোন জিনিষ (তাবিজ, কড়ি, মাদুলি ইত্যাদি) ঝুলালো তাকে সে জিনিষের প্রতি সঁপে দেয়া হবে।

(ত্ববরানী)

অপর এক হাদীসে রয়েছে-

إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا قال من الواهنة فقال إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو متّ وهي عليك ما أفلحت أبداً (أحمد، الطبراني، ابن حبان، حاكم)

অর্থাৎ- "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক ব্যক্তির হতে তামার বালা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কী ? সে বলল এটা দুর্বলতা থেকে বাঁচার জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- এটা খুলে ফেল। কেননা এটা তো তোমার দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই বাড়াবে না। আর

যদি তুমি এটা সহ মৃত্যুবরণ কর তবে কখনই সফল (জান্নাতে প্রবেশ) হতে পারবে না ।"

(আহমদ, ত্ববরানী, ইবনু হিব্বান, হাকেম)

হাকেম বলেন- হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ। ইমাম যাহাবী হাকেমের মন্তব্য সঠিক বলে স্বীকার করেছেন।

১৭. দুআ ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

উত্তর ঃ ☒

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

الدعاء مخ العبادة (ترمذى)

অর্থাৎ- "দুআ ইবাদাতের সারবস্তা ।" (তিরমিযি)

অপর হাদীসে তিনি বলেন-

الدعاء هو العبادة (أحمد، ترمذى، أبو داود، نسائى)

অর্থাৎ- "দুআই হল ইবাদাত ।" (আহমাদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ,)

১৮. যে সকল কাফিরের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জিহাদ করেছিলেন তারা আল্লাহকে স্রষ্টা, রিজিকদাতা ও বিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী বলে স্বীকার করত। এ স্বীকারোক্তি তাদেরকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করেনি।

উত্তর ঃ ☑

আল্লাহ বলেন-

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ — (سورة يونس–٣١)

অর্থাৎ- "তুমি (কাফেরদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে জীবিকা দান করে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান-চোখের মালিক ? তা ছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে বের করেন জীবিতের মধ্য থেকে ? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা ? তখন তারা (কাফের) বলে উঠবে, আল্লাহ। তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছো না !" (সূরা ইউনুস- ৩১)

উপরোক্ত স্বীকৃতি কাফের সম্প্রদায়ের। এসব স্বীকৃতি সত্ত্বেও তাদেরকে মুসলিম হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। কেননা তারা আল্লাহর রব হওয়ার একত্ব স্বীকার করলেও মা'বুদ বা ইলাহ হওয়ার একত্বকে স্বীকার করেনি। তাই তারা কাফের।

১৯. মাজার স্পর্শ করে বরকত নেয়া, এতে চাঁদোয়া টাঙ্গানো, বাতি জ্বালানো, ফুল, খুশবু বা গোলাপজল ছিটানো, নজর-নিয়াজ পাঠানো, মাজারকে তাওয়াফ করা, মাজার থেকে পেছনমুখী হয়ে বের হওয়া, মাজারকেন্দ্রিক পুকুরের মাছ, কচ্ছপ, কুমির ইত্যাদিকে শ্রদ্ধাদজানানো নাজায়েজ।

উত্তর ঃ ☑

উপরোল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ই বিদয়াত কিংবা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এসব কাজের মাধ্যমে মাজার মূর্তিতে পরিণত হয়। আর তখন মাজারে এসব করার অর্থ হবে মুর্তির ইবাদাত করা। শিব নারায়ণের পূজা আর এ ধরনের পূজার মধ্যে কোনই ব্যবধান নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- অর্থাৎ- "হে আল্লাহ আমার কবরকে মূর্তি বানিও না।" (আহমাদ, আবু এ'য়ালা) আবু নোয়াইম তিনি বিশুদ্ধ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী শায়বা, আব্দুর রায্যাক।

উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেল পরকালের স্মরণ ও মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা, এ দু'উদ্দেশ্য ব্যতীত কবরবাসীর নিকট কিছু প্রার্থনা করা, তওয়াফ করা, বাতি জ্বালানো, চাঁদোয়া টাঙ্গানো এসব কিছু করলে সে কবর আর কবর থাকে না, বরং তা হয়ে যায় মূর্তি। আর ও সব কার্যাবলী হয়ে যায় মূর্তিপূজা। যা সম্পূর্ণ হারাম।

২০. তথাকথিত মারিফাতের দাবিদার ভ্রান্ত সুফী মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করে বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহর সাথে তাদের ভাষায় বিভিন্ন গাউছ, কুতুব, আবদাল, আওতাদের হাত আছে, এ বিশ্বাস শরীয়ত পরিপন্থী নয়।

উত্তর ঃ ☒

উপরোক্ত বিশ্বাসগুলো সম্পূর্ণ শরীয়া পরিপন্থী। বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহর কোন শরীক ও সহযোগী নেই। আল্লাহ বলেন-

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّه شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا – (سورة بنى إسرائيل-١١١)

অর্থাৎ- "বলুন ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।"

(সূরা বানী ইসরাইল- ১১১)

বিশ্বজাহানের কোন কাজে সৃষ্টির হাত আছে এটা বিশ্বাস করলে কাফের হয়ে যাবে। হদীসে কুদসীতে রয়েছে-

ومن قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذالك كافر بى ومؤمن بالكو الب (مسلم)

অর্থাৎ- "আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যে ব্যক্তি বলল ওমুক ওমুক নক্ষত্রের স্থানচ্যুত হওয়ার কারণে আমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি, তাহলে সে আমার সাথে কুফর করল এবং গ্রহ নক্ষত্রের উপর ঈমান আনল। (মুসলিম)

বৃষ্টি হওয়ার পেছনে গ্রহ, নক্ষত্রের হাত আছে বলে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি যেমন উক্ত হাদীস অনুসারে কাফের তেমনি বিশ্ব পরিচালনার কোন কাজে গাউস, কুতুব ইত্যাদির হাত আছে বলে বিশ্বাসকারী ব্যক্তিও কাফের।

সংক্ষিপ্ত

প্রশ্ন ও উত্তর

দ্বিতীয় পর্ব

১. দ্বীন পবিত্র বস্তু, পক্ষান্তরে রাজনীতি হল নোংরা বিষয়, তাই দ্বীনকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে হবে যাতে দ্বীন তার পবিত্রতা নিয়ে বহাল থাকে। এ ধরনের বিশ্বাস বা উক্তি কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ নাজায়েজ।

দ্বীনকে রাজনীতি থেকে আলাদা করলে দ্বীন আর পরিপূর্ণ থাকে না। তা হয়ে যায় খণ্ডিত। দ্বীনকে খণ্ডিত করা কুফর।
আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَرُسُلِه وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِه وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلاً أُولـــئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا – (سورة النساء–١٥٠–١٥١)

অর্থাৎ- "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। এরাই হলো প্রকৃত কাফের।

(সূরা নিসা- ১৫০ ও ১৫১)

তা ছাড়া দ্বীনকে রাজনীতি থেকে আলাদা করলে রাজনীতিতে তাগুতের আনুগত্য করতে হবে। আর তাগুতের আনুগত্য শিরকে আকবার। তাগুতকে অস্বীকার করা ঈমানের মৌলিক অংগ। আল্লাহ বলেন-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لاَ انْفِصَامَ لَهَا –
(سورة البقرة–٢٥٦)

অর্থাৎ- "যে গুমরাহকারী তাগুতের সাথে কুফর করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে, সে ধারণ করবে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙবার নয়।"

(সূরা বাকারা- ২৫৬)

সুদৃঢ় হাতল বলতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। এ হাতল দুটো জিনিস দিয়ে আঁকড়ে ধরতে হবে।

১. তাগুতের প্রতি অস্বীকার।

তাগুত মানে আল্লাহর দ্বীনের আইন বিধান লঙ্ঘনকারী যে কোনো জিনিস। রাজনীতিতে দ্বীন না থাকলে সে রাজনীতি অবশ্যই আল্লাহর আইন বিধান লঙ্ঘন করবে এবং তাগুত নামে আখ্যায়িত হবে।

২. আল্লাহর প্রতি ঈমান

উপরোক্ত দুটো জিনিসের কোন একটি বাদ দিলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কে আঁকড়ে ধরা হল না। অর্থাৎ সে ব্যক্তিটি কাফের থেকে গেল।

রাজনীতি যখন তাগুত হয়ে যায় তখন স্বভাবতই সে রাজনীতির যারা জনক তারা হয়ে যায় তাগুতের জনক। যারা আল্লাহর রাজনৈতিক, ফৌজদারী, দেওয়ানী আইনসমূহ থাকা অবস্থায় সেগুলো বাদ দিয়ে নিজেরা আইন তৈরী করবে, এমতাবস্থায় তারা হয়ে যাবে আল্লাহর শরীক দেবতা। এদেরকে যারা ভোট দিবে তাদের এ ভোট, এদের প্রতি ঈমান আনা এবং এদের আইন মেনে নেয়া এদের ইবাদাত করার শামিল হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি তাগুত হয়ে যায় সে এবং তার প্রতি বিশ্বাসী ও অনুগতরা জাহান্নামে পতিত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

ويتبع من كان يعبد الطو اغيت الطوا غيت (مسلم)

অর্থাৎ- "যারা তাগুতসমূহের ইবাদাত করত তারা (হাশরের মাঠ হতে জাহান্নামের দিকে রওয়ানা হওয়ার সময়) তাগুতসমূহের অনুসারী হবে।

(সহীহ মুসলিম)

রাজনীতি নোংরা নীতির নাম নয়। রাজনীতি মূলত একটি মহান নীতি। দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে তা নোংরা হয়েছে। ধর্মহীন রাজনীতি হল নোংরা। অতএব রাজনীতির ইসলামীকরণ অপরিহার্য্য। ইসলামতো নোংরাকে পবিত্র করার জন্যই পৃথিবীতে নাযিল হয়েছে।

রাজনীতিহীন ধার্মিক সূরা আল ফাতেহায় উল্লেখিত 'দোয়াল্লীন' (বিভ্রান্ত) এর অন্তর্ভুক্ত। এ স্বভাবটি খ্রিস্টান পাদ্রীদের, যারা গির্জায় বসে ধর্মকর্ম করে কিন্তু রাজনীতি করে না।

ধর্মহীন রাজনীতিক উক্ত সূরার 'আল মাগদুব আলাইহিম' (আল্লাহর গযব প্রাপ্ত) এর অন্তর্ভুক্ত। এ স্বভাবটি ইহুদীদের, যারা রাজনীতি করে কিন্তু ধর্মকর্ম করে না। এদের ধর্মহীনতার অনেক কাহিনী কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এ জন্য আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। দোয়াল্লিন ও মাগদুব আলাইহিম উভয়ের পরিণাম জাহান্নাম। অতএব তাদের অনুসরণ পরিত্যাজ্য। যারা ধার্মিক রাজনীতিক তারা সূরা আল ফাতেহার 'আল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম' (নেয়ামত প্রাপ্তদের) অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারী আবু বকর, উমর, উসমান, আলী ও সাহাবীগণ ধার্মিক রাজনীতিকগণের অন্তর্ভুক্ত। যাঁরা ব্যক্তিগত ইবাদাতের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে বিশ্ব নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আল্লাহ বিরোধী আইনের নিকট যে বিচার প্রার্থনা করে সূরা নিসার ৬০ ও ৬১ আয়াতে আল্লাহ তাকে কাফির, বিভ্রান্ত ও মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২. কেবল কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাগদাদ, আজমীর, সিলেটসহ দূর-দূরান্ত সফর করা কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ না জায়েজ।

দলিল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدى هذا

والمسجد الأقصى (بخارى، مسلم، ابو داؤد، نسائى، أحمد)

অর্থাৎ- "তিনটি মসজিদ ব্যতীত (ইবাদাত বা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে) কোথাও সফর করা যাবে না। (মসজিদ তিনটি হল) মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা।

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ)

ইমাম মালিক তার মুয়াত্তা গ্রন্থে আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবু বাসরার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন কোথা থেকে এসেছ ? আমি বললাম তুর থেকে। তিনি বললেন- তুমি বের হবার আগে যদি আমি তোমাকে পেতাম তাহলে তুমি তুরের দিকে বের হতে পারতে না। কেননা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনটি মসজিদ ব্যতীত যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আর কোথাও সফর করা যাবে না। অর্থাৎ এ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অপর কোন মসজিদ, নবীগণের স্মৃতিময় স্থান অথবা কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না।

৩. শুধুমাত্র আল্লাহর মুহাব্বাত অন্তরে নিয়ে কি তাঁর ইবাদাত করা জায়েজ?

উত্তর ঃ নাজায়েজ ।

কেননা আল্লাহর ইবাদাত করতে হয় তিনটি জিনিসের সমন্বয়ে ।

(ক) মুহাব্বাত । সূরা ফাতেহার প্রথম আয়াতটি মুহাব্বাতের আয়াত । কারো অন্তরে কারো প্রতি ভালবাসা থাকলেই সে তার প্রশংসা করে । প্রশংসা মানে হল কাউকে ভালবেসে তার গুণগান করা ।

(খ) আশা-প্রত্যাশা । সূরা ফাতেহার দ্বিতীয় আয়াতটি আশা-প্রত্যাশার আয়াত । কোন কাঙ্গাল দয়ালু ধনবানকে দেখলে তার কাছে কিছু আশা করে । আল্লাহ রাহমান রাহীম হওয়ার কারণে তাঁর সান্নিধ্যে গেলে তাঁর কাছে কিছু পাওয়ার আশা অন্তরে জেগে উঠে ।

(গ) ভয় । সূরা ফাতেহার তৃতীয় আয়াতটি ভয়ের আয়াত । কেননা বিচারককে সকলেই ভয় পায় । ন্যায় বিচারক হলে তো অপরাধীর ভয় আরো বেড়ে যায় । ইহুদী-খ্রিস্টানরা শুধু মুহাব্বাত দিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে । শেষ পর্যন্ত তারা বলে বসল-

نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاءُهُ – (سورة المائدة–١٨)

অর্থাৎ- "আমরা তো আল্লাহর সন্তান ও তার প্রিয়জন ।"

(সূরা মায়েদা- ১৮)

নিজকে আল্লাহর সন্তান দাবি করা শিরকে আকবার । প্রিয়জন বলে দাবি করা মিথ্যাচার । বুঝা গেল যারা ভয়-ভীতি, আশা-প্রত্যাশা ছাড়া শুধু মুহাব্বাত দিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে তারা শিরক এবং মিথ্যাচারে আক্রান্ত হয় । আমাদের দেশে আল্লাহর শুধু মুহাব্বাতের দাবিদার, ভ্রান্ত মারেফাতীরাও বিভিন্ন শিরক ও মিথ্যায় আক্রান্ত হয়েছে ।

৪. আল্লাহর নামে মাজারের ওলীর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে কি কোন প্রাণী জবেহ করা জায়েজ ?

উত্তর ঃ না জায়েজ ।

দলিল ঃ- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لعن الله من ذبح لغير الله (مسلم)

অর্থাৎ- "আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে জবেহ করে।"(মুসলিম)

যে ব্যক্তি কারো নৈকট্য হাসিল করার জন্য তার উদ্দেশ্যে কোন কিছু জবেহ করল এ কাজ দ্বারা সে মুরতাদ হয়ে গেল। ইমাম নববী বলেন-

فان قصد مع ذالك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلم قبل ذلك صار بالذبح مرتدا (الشرك ومظاهره- ٢٥٢)

অর্থাৎ- "আল্লাহ ব্যতীত যার জন্য সে জবেহ করল তার তাযীম ও ইবাদাতের উদ্দেশ্যে করলে এটি কুফর হবে। ইতোপূর্বে লোকটি যদি মুসলিম হয়ে থাকে তাহলে এ জবেহ করার মাধ্যমে সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

(আশ্ শিরকু ওয়া মাজাহিরুহু- ২৫২)

এ ধরনের তা'যীম ও নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যসহ যার জন্য জবেহ করা হলো এ ব্যক্তির জন্য সে তাগুত ও মূর্তি হয়ে গেল। নিষ্প্রাণ মূর্তির উদ্দেশ্যে জবেহ করা যেমন শিরকে আকবার তেমনি জীবন্ত এ মূর্তির উদ্দেশ্যে জবেহ করাও শিরকে আকবার। আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করলেও তা শিরকে আকবার হবে। কেননা মুখে আল্লাহর নাম নিলেও অন্তরে সে উদ্দেশ্যে করেছে গায়রুল্লাহকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত-

عن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل فى ذباب ودخل النار رجل فى ذباب قالوا وكيف ذالك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا قالوا لأحدهما قرب قال ليس عندى شئ أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للأخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة (رواه أحمد)

অর্থাৎ- "একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করেছে, আরেকটি মাছির কারণে আরেক ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। সাহবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এটা কীভাবে ? তিনি বললেন, দু'ব্যক্তি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল যাদের এমন একটি মূর্তি ছিল যার জন্য কিছু কুরবানী না করে কেউ সে পথ অতিক্রম করতে পারত না। মূর্তিপূজারীরা

তাদের একজনকে বলল, বলি দাও। আমার কাছে বলি দেয়ার মত কিছু নেই। তারা বলল, একটি মাছি হলেও বলি দাও। সে একটি মাছি বলি করল। ফলে তারা তাকে ছেড়ে দিল। এ কারণে লোকটি জাহান্নামে প্রবেশ করল। তারা অপর ব্যক্তিকে বলল, তুমি বলি দাও। সে বলল, আমি মহান আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য কিছুই বলি করব না। তারা তাকে হত্যা করল। ফলে লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করল।

(মুসনাদে আহমাদ)

এতে বুঝা গেল জীবন্ত ও মৃত মূর্তির জন্য জবেহ করলে এর পরিণাম হলো জাহান্নাম। মাজার, দরগাহ, ওরশ ও পীরের সম্মানার্থে যারা গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি মান্নত অথবা জবেহ করে তারা ঐ ব্যক্তির মতই যে মূর্তির উদ্দেশ্যে মাছি জবেহ করে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। পুল বা ইমারত তৈরীর সময় যারা রক্ত বলি দেয় তারও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

৫. সাহাবায়ে কিরামদের আদীল (ন্যায়পরায়ণ) হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ নাজায়েজ।

দলিল ঃ হাদীসশাস্ত্রবিদদের সর্বসম্মত অভিমত হলো-

الصحابة كلهم عدول

অর্থাৎ- "সাহাবাগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ। বিশেষ করে দ্বীনি বিষয়সমূহে তাদের ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সাহাবাদের ব্যাপারে তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ বলেন-

رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ– (سورة التوبة–١٠٠)

অর্থাৎ- "আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।"

(সূরা আত-তাওবা- ১০০)

সাহাবাগণ অন্যায়কারী হলে কিছুতেই আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হতেন না। কেননা অন্যায়কারী ও সীমালঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন না।

ন্যায়পরায়ণদেরকে তিনি ভালবাসেন। আল্লাহ বলেন-

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ – (سورة الحجرات–٩)

অর্থাৎ- "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আল হুজুরাত- ৯)

৬. কবরের উপরে গম্বুজ, সৌধ বা গৃহ নির্মাণ কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ নাজায়েজ।

দলিল ঃ হাদিসে রয়েছে-

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور و يقعد عليها أو يصلى عليها (مسند أبو يعلى)

অর্থাৎ- "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা, তার পাশে বসা এবং তার পাশে সালাত পড়া থেকে নিষেধ করেছেন। (মুসনাদে আবু ই'য়ালা) সনদ বিশুদ্ধ।

এ হাদীস দ্বারা কবরের উপর গম্বুজ, সৌধ, গৃহ, প্রাচীরসহ সকল নির্মাণ নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কক্ষে সমাহিত করা হয়েছে। তাঁর কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা হয়নি। "বাইরে কবর দিলে লোকেরা তাঁর কবরকে ইবাদাতের স্থান বানিয়ে ফেলবে এ আশংকা না থাকলে তাঁকে বাইরে কবর দেয়া হতো।" (বুখারী)

৭. রাশি চক্রে বিশ্বাস করা কি জায়েজ ?

দলিল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

(مسلم، أحمد، بزار طبرانى أبو داؤد)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি কোন গণক অথবা জ্যোতিষীর কাছে গমন করল এবং সে যা বলল তা বিশ্বাস করল তাহলে সে মুহাম্মাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তাঁর সাথে কুফর করল। (আহমাদ, মুসলিম, বায্‌যার, ত্বাবরানী, আবু দাউদ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে-

من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما ز اد

(أحمد ابو داؤد إبن ماجة ورجاله ثقات)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোন জ্ঞান চয়ন করল সে যাদু টোনার একটি শাখা চয়ন করল। যা সে বাড়াতে চায় বাড়িয়ে নিক।" (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ) ইবনু মাজাহার রাবীগণ বিশ্বস্ত। নববী হাদীসটিকে বিশুদ্ধ

বলেছেন। রাশিচক্র জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এটা বিশ্বাস করা কুফর।

৮. শহিদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ, প্রতিকৃতি, নেতৃবৃন্দের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, এক মিনিট নিরবতা পালন করা কি জায়েজ ?
উত্তর ঃ না জায়েজ।

(ক) পুষ্পস্তবক অর্পণ ঃ যারা শহীদ হয়েছেন, ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মা আল্লাহর কাছে পুষ্পপল্লবে ঘেরা ঘন সবুজ শ্যামল বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ সুরভিত জান্নাতে বিচরণ করছে। শহীদ এবং ঈমানসহ মৃত্যুবরণকারী সকল মুসলিমের আত্মাই তাদের যোগ্যতা ও আমলের তারতম্য অনুসারে পাখিরূপে জান্নাতে রয়েছে বলে বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شائت (مسلم)

অর্থাৎ- "শহীদগণের রূহ আল্লাহর সান্নিধ্যে সবুজ পাখিদের মধ্যে থাকবে এবং জান্নাতের বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহে ভ্রমণ করবে।"

(সহীহ মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-

نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه (أحمد)

অর্থাৎ- "মুমিনের আত্মা একটি পাখি হিসেবে জান্নাতের বৃক্ষরাজিতে বিচরণ করতে থাকবে। আল্লাহ যেদিন তাকে পুনরুত্থিত করবেন সেদিন তার দেহে আত্মাটি ফিরিয়ে দেয়া পর্যন্ত এ ভাবেই থাকবে। (আহমাদ) এর সনদটি অনেক উচুঁমানের। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে-

فاطلع عليهم إطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أى شئ نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا (مسلم)

অর্থাৎ- "শহীদগণের আত্মার প্রতি আল্লাহ দৃষ্টি দেবেন এবং বলবেন তোমরা কি কিছু কামনা করছ ? তারা বলবেন আমরা আর কী কামনা করব ! আমরা তো যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিচরণ করছি। (মুসলিম)

শহীদরা যেখানে আল্লাহর কাছেই আর কিছুই কামনা করছে না, সেখানে কি তারা আমাদের এসব মূল্যহীন পুষ্পস্তবকের জন্য অপেক্ষা করছে ?

শহীদ ও মৃত ব্যক্তিদের জন্য অন্তরে বাস্তব দরদ থাকলে, তাদের ত্যাগ তিতিক্ষার কিছু বিনিময় দেয়ার মনোবৃত্তি থাকলে সে পথটি খুঁজতে হবে, যে পথে কিছু করলে তারা পরকালে উপকৃত হবে। সে পথটি হল আল্লাহর অনুমোদিত পথ। শহীদ ও মৃতদের জন্য তাদের নিয়্যত করে তাদের উদ্দেশ্যে যদি কেউ দান খায়রাত করেন, তাদের উদ্দেশ্যে, তাদের পক্ষ হয়ে জনকল্যাণমূলক কোন কাজ করেন তাহলে এর বিনিময়ে তারা শত কোটি পুষ্প অফুরন্ত নেয়ামত, ফুলে ফলে ভরা উদ্যানের মালিক হতে পারেন আল্লাহর কাছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من قال سبحان الله غرست له نخلة فى الجنة (ترمذى)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি একবার সুবহানাল্লাহ বলল তার জন্য একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে জান্নাতে। (তিরমিযি) অপর বর্ণনায় রয়েছে- "সে গাছটির ছায়ায় একশত বছর দ্রুতগামী ঘোড়া দৌড়ালেও তার ছায়া শেষ করা যাবে না।" বুঝা গেল পৃথিবীতে বসে সৎ কর্মের মাধ্যমে ঊর্ধ্বজগতে নিজের জন্য কিংবা কোন মৃতের জন্য উদ্যান তৈরী করা যায়। পৃথিবীতে বসে এমন কাজটি করতে হবে যা ঊর্ধ্বজগতের বাসিন্দাদের নিকট পৌঁছায়। তার পদ্ধতি উপরে আমরা উল্লেখ করেছি। আর এটাই হল তাদের জন্য সম্মান প্রদর্শন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إن أعمالكم تعرض على عشائركم و على أقربائكم فى قبورهم فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك

(ابو داؤد الطيالسى، أحمد، الطبرانى)

অর্থাৎ- "তোমাদের আমলগুলো তোমাদের মৃত নিকটাত্মীয় ও তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে তাদের কবরে পেশ করা হয়। আমলগুলো ভাল হলে তারা আনন্দিত হয় আর অন্য কিছু হলে তারা বলে হে আল্লাহ তাদেরকে তোমার আনুগত্যের আমল করার এলহাম কর।

(আবু দাউদ ত্বয়ালেসী, ত্ববরানী, আহমাদ)

বুঝা গেল শহীদ ও মৃতদেরকে তারাই আনন্দিত ও উপকৃত করে যারা তাদের জন্য দুআ ও দান-খায়রাত করে। পুষ্পস্তবক অর্পণকারীদের এই কর্মে

তারা কবরে দুঃখ অনুভব করে। আমাদের দেশে যা করা হয় এতে মনে হয় শহীদগণ দেশের জন্য শহীদ হয়ে যেন অপরাধ করে গেছেন। তাদের নামে এমন সব কর্মকাণ্ড করা হয় যা তাদের ত্যাগ তিতিক্ষার প্রতি উপহাসের শামিল। ইট, সিমেন্ট, রড দিয়ে কিছু একটা বানিয়ে সেখানে কিছু ফুল রেখে আসলে তা কি শহীদগণ পেলেন নাকি ঐ ইট, সিমেন্ট, রড গুলোকেই দেয়া হল সেই ফুলের সওগাত। কাদের থেকে শিখেছি এই পুষ্পস্তবক অর্পণ? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আণিত দ্বীনে পুষ্পস্তবক অর্পণের কোন বিধান নেই। মৃতদের জন্য পুষ্প স্তবক অর্পণ খ্রিস্টান জাতির সংস্কৃতি। হিন্দু ধর্মেও মূর্তি দেবীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। শুধু পুষ্পস্তবক নয় মিষ্টি সন্দেশ, দুধ কলার স্তবকও অর্পণ করা হয় দেবভোগ হিসাবে।

আল কুরআনে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে-

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ – (سورة الصافات-٩١)

অর্থাৎ- "অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে গিয়ে ঢুকল এবং মূর্তিগুলোকে সম্বোধন করে বলল, কী হলো তোমাদের খাচ্ছ না কেন ?

(সূরা সাফ্‌ফাত- ৯১)

মূলত পুষ্পস্তবক অর্পণ মূর্তিপূজার অংশ। এটি একটি ইবাদাত যা মূর্তিকে দেয়া হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

من تشبه بقوم فهو منهم (أبو داؤد)

অর্থাৎ- "কোন ব্যক্তি সংস্কৃতিতে যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।"

(আবু দাউদ) হাদীসটির সনদ উত্তম।

(খ) এক মিনিট নিরবতা পালন ঃ এটা হারাম। কায়েস ইবনু আবী হাযেম বলেন-

عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر رضى الله عنه على إمر أة من أحمس يقال لها زينب فرأها لا تتكلم فقال ما لها لا تكلم فقالوا حجة مصمتة فقال لها تكلمى فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت

(بخاری)

অর্থাৎ- "আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু (হজের মওসুমে) যায়নাব নামক আহমাস গোত্রীয় এক মহিলার কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন, সে কথা বলে

না। তিনি বললেন, সে কথা বলে না কেন ? লোকেরা বলল- তার হজটি এমন যাতে সে নিরবতা পালন করছে। আবু বকর তাকে বললেন- তুমি কথা বল। তোমার এ নিরবতা পালন অবৈধ। এটি জাহেলিয়্যাত (শিরক ও অজ্ঞতা) যুগের কাজ। অত:পর সে মহিলাটি কথা বলল। (বুখারী)

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

অর্থাৎ-"তোমরা আল্লাহর জন্য নিরবতা পালন করো।"

অপর এক হাদীসে হক ও সত্য থেকে নিরবতা পালনকারীকে বোবা শয়তান বলা হয়েছে। মৃতদের জন্য দু'আ করা একটি হক ও সত্য দ্বীনি বিধান। তা না করে যারা নিরব থাকে তারা উক্ত হাদীস অনুযায়ী বোবা শয়তান। আল্লাহ তো বোবা হতে কাউকে নির্দেশ দেননি। তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে মুখ খুলে দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন-

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيْراً – (سورة بنى إسراءيل–٢٤)

অর্থাৎ- "এবং তুমি বল ! হে পালনকর্তা ! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছেন।

(সূরা বনি ইসরাইল- ২৪)

৯. কুকুরের ঘেউ ঘেউ, পেঁচার ডাক, যাত্রাকালে খালি কলসি দেখাকে অশুভ লক্ষণ মনে করা কি জায়েজ?

উত্তর ঃ নাজায়েজ।

দলিল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

الطيرة شرك (أبو داؤد، ترمذى، ابن حبان)

অর্থাৎ- "কোন কিছুকে অশুভ মনে করা শিরক।"

(আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনু হিব্বান) ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-

من ردته الطيرة عن شئ فقد قارف الشرك (بزار رجاله ثقات)

অর্থাৎ- "অশুভ লক্ষণের ধারণা যাকে কোন কিছু থেকে বিরত করল সে শিরক উপার্জন করল। (বায্যার) রাবীগণ বিশ্বস্ত।

১০. মান্যবর ব্যক্তিদের সামনে প্রবেশকালে মাথা নিচু কিংবা অবনমিত করা কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ নাজায়েজ ।

দলিল ঃ সম্মানার্থে মাথা অবনমিত করার দ্বারা আল্লাহর ইবাদাত করা হয় । যেমন রুকু করা, মানে আল্লাহর সামনে মাথা অবনমিত করা । এটি একটি ইবাদাত । আল্লাহর ইবাদাতের কোন অংশ অপর কাউকে দেয়া শিরক । যা নিষিদ্ধ । আল্লাহ বলেন

أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ – (سورة يوسف–٤٠)

অর্থাৎ- "তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করো না ।" এটাই সরল পথ । (সূরা ইউসুফ-৪০)

১১. বৈষয়িক স্বার্থে দ্বীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ও মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা ছাড়ানো কি জায়েজ?

উত্তর ঃ নাজায়েজ ।

দলিল ঃ আল্লাহ বলেন-

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولـــئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ– (سورة ال عمران–١٠٥)

অর্থাৎ- "তাদের মত হয়ো না যারা বিভক্ত হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পর বিরোধিতা করতে শুরু করেছে- তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর আযাব ।

(সূরা আলে ইমরান- ১০৫)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ– (سورة البروج–١٠)

অর্থাৎ- "যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে ফিতনাগ্রস্ত করেছে অতঃপর তাওবা করেনি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি- আর আছে দহন যন্ত্রণা ।"

(সূরা বুরুজ- ১০)

বস্তুত প্রতিটি মুসলিমের উপর ইসলামকে পুরোপুরি অনুসরণ করা ফরজ । ইসলামের একেকটা অংশ নিয়ে একেক দল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া

হারাম। পারস্পরিক স্বার্থপরতা, সম্পদ ও মর্যাদার লোভ-লালসা হেতু নিজেদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا هيه (إبن ماجة)

অর্থাৎ- "দুনিয়ার ধন সম্পদ বিপুল পরিমাণে তোমাদের উপর ঢেলে দেয়া হবে। এমনকি দুনিয়ার প্রাচুর্য্যের কামনাই তোমাদের এক একজনের অন্তরকে বাঁকা করে দেবে।" (ইবনু মাজা)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-

لاالفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسو ها
كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم (بخارى، إبن ماجة)

অর্থাৎ- "আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের ভয় করি না। তবে তোমাদের উপর দুনিয়ার ধন সম্পদের বিস্তার লাভ করার ভয় করছি। যার ফলে পূর্ববর্তীরা যেমন ধন-সম্পদের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল, তোমরাও তেমনি এ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। অতঃপর ধন-সম্পদ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে যেমনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। (বুখারী, ইবনু মাজা)

বুঝা গেল বৈষয়িক স্বার্থের কারণেই মুসলিম জাতি বিভক্তি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। একদল ইসলামের যে অংশ পালন করে অপর দল তাদের সাথে শত্রুতাহেতু সে অংশ বর্জন করে। প্রত্যেকেই নিজের অংশ নিয়ে আত্মপ্রসাদে ভোগে। কেউ যিকির নিয়ে আলাদা হয়ে গেল, কেউ আলাদা হল রাজনীতি নিয়ে, কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আধ্যাত্মিকতা নিয়ে, কেউ বিচ্ছিন্ন হল ইলম্ চর্চা নিয়ে। যারা যিকর করে তারা রাজনীতি করতে রাজি নয়। যারা রাজনীতি করে তারা রাজনীতি নিয়েই শুধু ব্যস্ত। ইলম চর্চা নিয়ে যারা রয়েছেন তারা এর বাইরে যেতে চান না। তারা শুধু ইলম্ নিয়েই মহাখুশি।

এভাবেই গোটা মুসলিম জাতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অথচ উচিত ছিল সকল ইসলামী কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করা। তাওহীদ ও সুন্নাহর অনুসরণ মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। আর শিরক ও বিদয়াত তাদেরকে করে বিভক্ত। এ বিভক্তিই মস্ত বড় ফিতনা। কবর ও মাজার পূজা দিয়ে ফিতনাগ্রস্ত করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ রাজনৈতিক নেতারা কুরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত আইন কানুন ও অপসংস্কৃতি দিয়ে গোটা জাতিকে ডুবিয়ে দিয়েছে শিরক ও কুফরের অন্ধকারে। শিরক ও কুফরের চেয়ে বড় কোন ফিতনা নেই। যারা ঈমানদারদেরকে এ ধরনের

ফিতনার মধ্যে ফেলে দেয় তাদের জন্য আল কুরআনে কঠিন শাস্তির হুমকি এসেছে।

১২. বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য সফর করা কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ জায়েজ।

দলিল ঃ- ইবাদাতের উদ্দেশ্যে বায়তুল মোকাদ্দাস সফর করা হাদীসের আলোকে বৈধ। এ সম্পর্কে দলিল সহ পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. ওলি-আউলিয়া ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের কারামত অস্বীকার করা কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ নাজায়েজ।

ওলী-আউলিয়াদের কারামত সত্য। আম ভাবে তাদের কারামত অস্বীকার করা যাবে না। 'কিন্তু বিশেষ কোন ওলীর বিশেষ কোন কারামাত কেউ অস্বীকার করলে এতে কিছু বলার নেই।'

(আশ্ শিরকু ওয়া মাজাহিরুহু- ১৩০)

সবচেয়ে বড় কারামত হল তাক্বওয়া। আল্লাহ্ বলেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ – (سورة الحجرات–١٣)

অর্থাৎ- "আল্লাহর কাছে, তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক কারামত তথা সম্মানের অধিকারী সেই যে সর্বাধিক তাকওয়াশীল।"

(সূরা আলা হুজুরাত- ১৩)

১৪. কবরবাসীদের নৈকট্য লাভ ও তাদের ওসীলাহ্ নেয়ার জন্যে কবরস্থানে যাওয়া কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ না জায়েজ।

কবরবাসীদের নৈকট্য লাভ কিংবা তাদের ওসীলাহ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়া শিরকের মাধ্যম বরং ক্ষেত্র বিশেষে শিরকও বটে। পরকালের স্মরণ ও মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করাই হতে হবে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য। ওসীলা গ্রহণ বিষয়টি এই পর্বের ১৭ নং প্রশ্ন ও উত্তরে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

১৫. যাদু-টোনা চর্চা কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ নাজায়েজ ।

দলিল ঃ- আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

(سورة البقرة-١٠٢)

অর্থাৎ- "সুলায়মান কুফর করে নি। কিন্তু শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।"

(সূরা আলা বাকারা-১০২)

এ আয়াতে যাদু শিক্ষাকে কুফর বলা হয়েছে। অতএব যে যাদু শেখে কিংবা শিক্ষা দেয় সে কাফের।

১৬. হে আল্লাহ ! আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত থেকে বঞ্চিত করো না অথবা হে আল্লাহ ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার জন্য শাফায়াতকারী বানিয়ে দাও। এ ধরনের বাক্যে শাফায়াত তলব করা কি জায়েজ ।

উত্তর ঃ জায়েজ ।

দলিল ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعاً - (سورة زمر-٤٤)

অর্থাৎ- "বল ! শাফায়াত সম্পূর্ণটাই আল্লাহর জন্য।" (সূরা যুমার- ৪৪)

'আশ্ শিরকু ওয়া মাজাহিরুহু' গ্রন্থকার বলেন-

اللهم شفع فينا خاتم النبيين وإمام المرسلين فهذا طلب صحيح ودعاء مشروع لأن الشفاعة لله جميعا (الشرك ومظاهره-٢٢٥)

অর্থাৎ- "শাফায়াত আল্লাহর নিকট চাইতে হবে। যেমন- আমরা বলব, হে আল্লাহ শেষ নবী ও ইমামুল মুরসালীনকে আমাদের জন্য শাফায়াতকারী বানান। এ চাওয়াটি বিশুদ্ধ এবং বৈধ। কেননা সকল শাফায়াতই আল্লাহর মালিকানায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেঁচে থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে শাফায়াত চাওয়া বৈধ ছিল। হাদীসের মধ্যে রয়েছে-

ولقول غلام للنبي صلى الله عليه وسلم أسئلك أن تجعلني ممن تشفع له يوم القيامة فقال له فإتك ممن أشفع له يوم القيامة (رواه الطبراني رجاله ثقات)

অর্থাৎ- "একটি কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, হে, রাসূল ! আমি আপনার কাছে কিয়ামতের দিন আপনি যাদের জন্য শাফায়াত করবেন আমাকে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আমি যাদের জন্য সুপারিশ করব তুমি তাদের একজন।

(ত্বাবরানী) বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

কিয়ামতের দিন শাফায়াতকারী নবী ও পুণ্যবানদের কাছে শাফায়াত কামনা করা বৈধ হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون أدم........ (بخارى، مسلم)

অর্থাৎ- "কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষদেরকে একত্রিত করবেন। তারা বলবে, যদি আমাদের প্রভুর কাছে কারো দ্বারা শাফায়াত করাতাম, যাতে তিনি আমাদেরকে এ স্থান থেকে মুক্তি দেন। তারপর তারা শাফায়াতের উদ্দেশ্যে আদম আলাইহিস সালামের কাছে গমন করবে ...... (বুখারী, মুসলিম)

১৭. ওলি-আউলিয়া ও পুণ্যবানদের উচ্চ পদমর্যাদার ওসিলাহ নিয়ে দোয়া করা কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ নাজায়েজ।

দলিল ঃ দু'আর মধ্যে এধরনের ওসিলা দেয়া দু'আর ক্ষেত্রে সীমা লংঘনের শামিল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَّخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ – (سورة الاعراف–٥٥)

অর্থাৎ- "তোমরা কাকুতি মিনতি করে ও সংগোপনে তোমাদের প্রভুকে ডাক। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।"

(সূরা আ'রাফ- ৫৫)

এ ধরনের দু'আ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি। কোন সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমাম থেকেও বর্ণিত হয়নি। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতকালে বৃষ্টির জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দু'আকে ওসিলা বানিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওসিলা বানান নি। তাঁর ব্যক্তি সত্বাকে ওসিলা বানানো বৈধ হলে অবশ্যই তাঁকে ওসিলা বানিয়েই বৃষ্টির দু'আ করতেন। দু'আ একটি ইবাদাত। ইবাদাত ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকে যতক্ষন এর পক্ষে শরীয়ার দলিল পাওয়া না যায়। ব্যক্তি সত্বার ওসিলা দিয়ে

দু'আ করার পক্ষে যেহেতু শরীয়ার কোন দলিল নেই সেহেতু এই দু'আ হারাম। তা ছাড়া আল্লাহর উপর সৃষ্টির কোন অধিকার চলে না। তাই কারো নাম নিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা যাবে না।

আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে ঃ

(ক) তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের ওসিলা দিয়ে। আল্লাহ বলন-

وَ لِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا -(سورة الاعراف-١٨)

অর্থাৎ- "আল্লাহর রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম। তোমরা সে নামে তাঁকে ডাক।" (সূরা আ'রাফ- ১৮)

যেমন- কেউ বলল হে আল্লাহ তোমার গাফুর নামের ওসিলায় আমাকে ক্ষমা কর। তোমার রহমান নামের উসিলায় আমাকে রহমত কর।

(খ) তাঁর কোন গুণের ওসিলা দিয়ে। যেমন- হে আল্লাহ ! তুমি জ্ঞানী। তোমার এ গুণের ওসিলা দিয়ে তোমার কাছে দু'আ করছি, আমাকে জ্ঞান দাও।

(গ) নিজের কোন নেক আমলের ওসিলা দিয়ে। আল্লাহ বলেন-

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ - (سورة ال عمران-٥٣)

অর্থাৎ- "হে আল্লাহ তুমি যা নাযিল করেছ আমরা তার উপর ঈমান এনেছি এবং তোমার রাসূলের অনুসরণ করেছি অতএব তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত কর।"

(সূরা আলে ইমরান- ৫৩)

এ আয়াতে নিজেদের ঈমান ও রাসূলের অনুসরণকে ওসিলা দিয়ে দু'আ করা হয়েছে।

তিন ব্যক্তি পথ চলার সময় বৃষ্টি এলে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। একটি মস্ত বড় পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তারা তিনজনে তাদের তিনটি নেক আমলের ওসিলা দিয়ে দু'আ করে। তখন আল্লাহ পাথরটিকে গুহামুখ থেকে সরিয়ে দেন। ফলে তারা বেঁচে যায়। ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বুখারী ও মুসলিমে।

(ঘ) কোন জীবিত ব্যক্তির দু'আকে ওসিলা বানানো। অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির কাছে কেউ দু'আ চাইল এবং সে দু'আর ওসিলায় কোন কল্যাণ প্রাপ্তি বা অকল্যাণ থেকে মুক্তি কামনা করল। এটা বৈধ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قَالُوْا يَاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ - (سورة يوسف-٩٧)

অর্থাৎ- "তারা বলল, হে আমাদের পিতা ! আমাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আমরা গুনাহগার।"

(সূরা ঃ ইউসুফ- ৯৭)

১৮. আল্লাহর আইন চায় না এমন দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ নাজায়েজ।

দলিল ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولـٰـئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ – (سورة المائدة–٤٤)

অর্থাৎ- "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন বিধান দ্বারা বিচারকার্য করে না তারাই কাফের।"

(সূরা ঃ মায়েদা- ৪৪)

অতএব তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন বিধান অনুসারে বিচার-ফায়সালা করা অস্বীকার করবে সেও তাদেরই মত কাফের হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর আইন-বিধান চায় না নিশ্চয়ই তারা তাগুতের আইন বিধান চায়। তাগুতের আইন-বিধান চাওয়া আল্লাহর সাথে কুফরি করার শামিল। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা ইতিপূর্বেও আলোচনা করেছি।

১৯. কোন ওলী বা বুজুর্গ মৃতকে জীবিত করা কিংবা নিঃসন্তানকে সন্তান দিতে পারেন- এ বিশ্বাস করা কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ নাজায়েজ।

দলিল ঃ মৃতকে জীবিত করা আল্লাহরই কাজ। আল্লাহ বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَآثَارَهُمْ – (سورة يس–١٢)

অর্থাৎ- "আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি।"

(সূরা ইয়াসিন- ১২)

ঈসা আলাইহিস্ সালাম মোজেজা হিসেবে মৃতকে জীবিত করতেন। অর্থাৎ মৃতকে জীবিত করার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন এবং আল্লাহ ক্ষণকালের জন্য মৃতকে জীবিত করতেন। অতএব কাজটি আল্লাহরই ছিল। ঈসা আলাইহিস্ সালামের নয়। আল্লাহ বলেন-

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِإِذْنِي – (سورة المائدة–١١٠)

অর্থাৎ- "স্মরণ কর ঐ সময়কে যখন তুমি মৃতকে বের করতে আমার অনুমোদন ক্রমে।

(সূরা মায়েদা- ১১০)

নিঃসন্তানকে সন্তান দেয়া আল্লাহরই কাজ। এ কাজ করার ক্ষমতা আর কারো নেই। এই কাজের ক্ষমতা কোন সৃষ্টির মধ্যে আছে বলে মনে করা শিরক। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ - (سورة الشورى-٤٩-٥٠)

অর্থাৎ- "নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছে কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দান করেন অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।"

(সূরা শুরা- ৪৯ ও ৫১)

২০. ইজতিহাদী ভুলের কারণে কোন মুজতাহিদের মর্যাদাহানি করা কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ নাজায়েজ।

দলিল ঃ ইজতিহাদী (মাসআলা উদ্ভাবনী প্রয়াস) ভুল এ উম্মতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا - (سورة البقرة-٢٨٦)

অর্থাৎ- "হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি তবে আমাদের পাকড়াও করো না।"

(সূরা আল বাকারা- ২৮৬)

এ প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ্ বলবেন- হ্যাঁ। অর্থাৎ ক্ষমা করে দিলাম।

(সহীহ মুসলিম)

সংক্ষিপ্ত
প্রশ্ন ও উত্তর

তৃতীয় পর্ব

১. গণকও জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা

(ক) কবীরা (খ) কুফর (গ) সগীরা

উত্তর ঃ কুফর।

দলিল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

من أتا كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم– (أحمد، مسلم، بزار، أبو داؤد)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর কাছে গেল। অতঃপর তার কথা বিশ্বাস করল তবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফর করল।" (আহমাদ, বায্যার, আবু দাউদ)

আয়শা রাদিয়াল্লাল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, কিছু মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণক সম্পর্কে প্রশ্ন করল, উত্তরে তিনি বললেন, গণকরা কোন কিছুই না। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, গণকরা কখনও কখনও আমাদেরকে কোন বিষয়ে কথা বলে যা সত্য হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঐ সত্য কথাটি শয়তান আকাশ থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে আসে। তারপর তার বন্ধু তথা গণককে কানে কানে বলে দেয়। অতঃপর তারা ঐ কথার সাথে একশ'টি মিথ্যা কথা মিলিয়ে নেয়।

(বুখারী ও মুসলিম)

এ থেকে প্রমাণিত হলো গণক ও জ্যোতিষী শয়তানের বন্ধু, কাফের ও মিথ্যাবাদী।

২. গণক ও জ্যোতিষীর কাছে গায়েব জানার জন্যে যাওয়া ঃ

(ক) কবীর (খ) ছগীরা (গ) কুফর

উত্তর ঃ কবীরা।

দলিল ঃ (ক) প্রথম প্রশ্নে বর্ণিত জ্যোতিষী সংক্রান্ত হাদীস। কেননা জ্যোতিষ শাস্ত্রকে কুফর বলা হয়েছে। কুফরকে আল্লাহ হারাম করেছেন। আর তিনি হারামের সীমানার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا– (سورة البقرة–١٨٧)

অর্থাৎ- "এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব এর কাছেও যেও না। (সূরা আল বাকারা- ১৮৭)

(খ) কোন হারামের ওসিলা বা মাধ্যম হারামই হয়ে থাকে। গণক ও জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা যদি কুফর হয়ে থাকে তাহলে নিজেকে সে কুফরের সম্মুখীন করা, কুফর করার মত ভয়াবহ অবস্থার দিকে স্বেচ্ছায় নিজেকে ঠেলে দেয়া নিশ্চয় হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه
قالوا يا رسول الله هل يشتم الر جل والديه قال نعم يسب أبا الرجل
فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه– (مسلم)

অর্থাৎ- "কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়া কবিরা গুনাহ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! কোন ব্যক্তি কখনো কি তার মাতা-পিতাকে গালি দেয় ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে কোন ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয় ফলে সেও এ ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয় এবং সে তার মাকে গালি দেয় ফলে ঐ ব্যক্তি তার মাকে গালি দেয়।

(সহীহ মুসলিম)

উক্ত হাদীসে পিতা-মাতাকে গালির সম্মুখীন করাকে গালি দেয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সন্তান পিতা-মাতাকে গালি না দিলেও এমন কাজ করেছে যার কারণে পিতা-মাতাকে গালি শুনতে হয়েছে। পিতা-মাতাকে গালি দেয়া কবিরা গুনাহ। সে জন্য গালির কারণটিকেও কবিরা গুনাহ বলা হয়েছে। একজন শিল্পী সত্য কথাই বলেছেন

إن السلامة من سلمى وجار ها * ألاتحل على حال بواديها

অর্থাৎ- "সালমা ও তার প্রতিবেশিনীর অপকার থেকে সহিসালামতে থাকার উপায় হল এই যে, তুমি কোন অবস্থাতেই তার উপত্যকায় প্রবেশ করবে না।"

(আশ শিরকু ওয়া মাজাহিরুহু- ১০৫)

৩. ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন করা-

(ক) সুন্নাহ (খ) বিদয়াত (গ) ফিসক

উত্তর ঃ বিদয়াত।

দলিল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

وأياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

(أحمد، أبو داؤد، ترمذى، ابن ماجة)

অর্থাৎ- "নব উদ্ভাবিত (ধর্মীয়) বিষয়সমূহ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখ। কেননা সকল নব উদ্ভাবিত (ধর্মীয়) বিষয়ই বিদয়াত। আর সকল বিদয়াতই ভ্রান্তি।"

(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনু মাজাহ)

ঈদে মিলাদুন্নবী যেহেতু একটি নব উদ্ভাবিত বিষয়। অতএব তা বিদয়াত ও ভ্রান্তি।

৪. আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোন আইনকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা

(ক) কবীরা (খ) কুফর (গ) সগীরা

উত্তর ঃ কুফর।

দলিল ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ – (سورة النساء- ٥١-٥٢)

অর্থাৎ- "তুমি কি তাদের দেখনি যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা বিশ্বাস করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানের তুলনায় অধিকতর সরল ও সঠিক পথে রয়েছে। এরা হলো সে সমস্ত লোক যাদের উপর লা'নত করেছেন আল্লাহ স্বয়ং।

(সূরা নিসা- ৫১ ও ৫২)

৫. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের আক্বিদা হল, মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষ নবী। যারা এ আক্বিদায় বিশ্বাস করে না তারা-

(ক) শিয়া (খ) কাদিয়ানী (গ) খ্রিস্টান

উত্তর ঃ কাদিয়ানী।

দলিল ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلٰـــكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ – (سورة الاحزاب–٤٠)

অর্থাৎ- "(মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।" (সূরা আহযাব-৪০)

অতএব যে ব্যক্তি তাঁকে শেষ রাসূল হিসাবে মেনে নেয়নি সে কাদিয়ানী বা কাফের।

৬. আল্লাহ তা'য়ালা, রাসূল (সাঃ), তাঁর সহধর্মিনীগণ বা ফেরেশতাদের গালি দেয়া-

(ক) কবীরা (খ) কুফর (গ) সগীরা

উত্তর ঃ কুফর।

দলিল ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيْناً وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَاناً وَّإِثْماً مُّبِيْناً - (سورة الاحزاب– ٥٧–٥٨)

অর্থাৎ- "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (কুফর, অবাধ্যতা, গালি-গালাজ ইত্যাদির দ্বারা) কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত করেন। এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। আর যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।" (সূরা ঃ আহযাব- ৫৭ ও ৫৮)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন-

مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِّلّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ

(سورة البقرة–٩٨)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও রাসূলগণ এবং জীবরাইল ও মীকাইলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ সব কাফেরের শত্রু।"

(সূরা বাকারা- ৯৮)

৭. আল্লাহ পাক জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন-

(ক) ইবাদাতের জন্য (খ) ইমারাত নির্মাণের জন্য (গ) খেলাফতের জন্য

উত্তর ঃ ইবাদাতের জন্য ।

দলিল ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ – (سورة الذاريات–٥٦)

অর্থাৎ- "আমি তো মানুষ ও জ্বীন জাতিকে আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি ।

(সূরা যারিয়াত- ৫৬)

৮. আল্লাহ ফেরেশতাদের তৈরী করেছেন-

(ক) নূর দিয়ে (খ) মাটি দিয়ে (গ) আগুন দিয়ে

উত্তর ঃ নূর দিয়ে ।

দলিল ঃ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

خلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحى (ابن نشر–١/١١١)

অর্থাৎ- "সকল মালায়িকাই (ফেরেশতা) নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সম্প্রদায়টি (ইবলিস) ব্যতীত ।

(ইবনু কাসির ১/১১১)

৯. আল্লাহ তা'য়ালা কোথায়-

(ক) আসমানে (খ) সর্বত্র (গ) আরশের উপর

উত্তর ঃ আরশের উপর ।

দলিল ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلرَّحْمـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى – (سورة طه–٥)

অর্থাৎ- "রাহমান আরশের উপর সমাসীন ।" (সূরা ঃ ত্বাহা- ৫)

১০. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া-

(ক) বড় শিরক (খ) ছোট শিরক (গ) কবীরা

উত্তর ঃ ছোট শিরক ।

দলিল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

من حلف بغير الله فقد كفر أوأشرك (ترمذى، حسنه وصححه الحاكم)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করল সে কুফর অথবা শিরক করল।"

(তিরমিযি, হাকেম) হাকেম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

১১. আল্লাহ তাঁর কোন মাখলুকের মধ্যে নিজ সত্তার প্রকাশ ঘটান, এ আকিদা-

(ক) জায়েজ (খ) শিরক (গ) কুফর

উত্তর ঃ কুফর।

আল্লাহ তা'য়ালার সত্তা এক ও একক। তাঁর সত্ত্বা সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর সত্তার মধ্যে সৃষ্টিজগতের কোন অংশ নেই এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যেও তাঁর সত্তার কোন অংশ নেই। সৃষ্টিজগতের বহু উর্ধ্বে তিনি বিরাজমান, আরশের উপর সমাসীন। কোন মাখলুকের মধ্যে তাঁর সত্তা প্রবেশ করে এবং সে মাখলুকের ভেতর থেকে তিনি নিজ সত্তার প্রকাশ ঘটান এ আক্বিদা-বিশ্বাসকে পবিত্র কুরআনে সরাসরি কুফর বলা হয়েছে। খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যে আল্লাহ প্রবেশ করেছেন এবং সেখান থেকে নিজে প্রকাশিত হচ্ছেন এমন শয়তানী বিশ্বাস করার ফলে আল্লাহ তাদেরকে কাফের বলেছেন। আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ – (سورة المائدة-٧٢)

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই তারা কুফর করেছে যারা বলেছে মসীহ ইবনু মারইয়ামই (ঈসা আলাইহিস সালাম) আল্লাহ।"

(সূরা মায়েদা- ৭২)

পৌত্তলিকরা আরো মারাত্মকভাবে এ কুফরে লিপ্ত রয়েছে। তারা বলে-

তুমি সর্প হইয়া দংশন কর
ওঝা হইয়া ঝাড়।

তারা আল্লাহকে দংশনকারী সর্প ও ওঝা বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদের এ আখ্যা থেকে আল্লাহ পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে। তাদের একাংশ তথাকথিত পুনর্জন্মে পাপের কারণে খারাপ কিছু হয়ে পৃথিবীতে আবার জন্মলাভ করার হাত থেকে বাঁচার জন্য সন্ন্যাস ও যোগীবাদ আবিষ্কার করেছে। যোগসাধনা করতে করতে তারা পরমাত্মা তথা আল্লাহর সত্তায় লীন ও একাকার হয়ে যাবে! যাতে এ পৃথিবীতে খারাপ কিছু হয়ে আর আসতে না

হয়। শয়তান এমনিভাবেই তাদেরকে ভ্রান্তির অতল তলে তলিয়ে দিয়েছে। তাদের থেকে এ শিরকে আকবার ও পরিভাষাটি শিখেছেন আমাদের সুফীবাদী ও পীরবাদীগণ। হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদের 'মানবাত্মা পরমাত্মায় লীন' হওয়ার আক্বিদা ও পরিভাষাটি গ্রহণ করে তারা এর নাম দিয়েছেন 'ফানা ফিল্লাহ'। অর্থাৎ আল্লাহ আল্লাহ জপতে জপতে বান্দাহ আল্লাহর সত্তার সাথে মিশে যাবে। সেখানে বান্দাহ বলতে আর কিছু থাকবে না। এ বিশ্বাসটি হুবহু যোগী সন্ন্যাসীদের উপরোক্ত বিশ্বাসের ফটোকপি। এ জন্য অনেক সুফীবাদী নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করেছেন। হুসাইন বিন মনসুর হাল্লাজ এদের অন্যতম।

(তালবীসে ইবলিস- ১৭১ ও ১৭২)

নিজেকে রব হিসেবে দাবি করেছে যে ফিরআউন সেও এসব সুফীবাদীদের দৃষ্টিতে মস্ত বড় আল্লাহর ওলী ছিল। এভাবেই এসব বিভ্রান্ত দাজ্জালরা আল্লাহর এক জঘন্য দুশমন ফিরআউনকে আল্লাহর ওলী বলে নিজেদের কাতারে টেনে আনল। প্রকৃতপক্ষে এরাও এক একজন ফেরআইনের রূহানী চেলা। মনসুর হাল্লাজকে তার এ কুফুরী আক্বিদা ও উক্তির কারণে ইসলামী আইনবিশারদগণের সর্বসম্মত রায়ের প্রেক্ষিতে কাফের সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

বর্তমানে অনেককে বলতে শোনা যায়-

মুহাম্মাদ খোদা নেহী, খোদা সে যুদা নেহী

এ সব ভ্রান্ত মারফতীরা ফেরআউন ও যোগী সন্ন্যাসীদের উম্মত। আবার কাউকে বলতে শোনা যায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জাতি নূরের তৈরী। ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সন্তান বলা আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর জাতি নূরের তৈরি বলা একই কুফরের এপিঠ ওপিঠ। একটা ওল্ড মডেল আরেকটা নিউ মডেল। কারণ সন্তান যেমন পিতার অংগ তেমনি জাতি নূরের তৈরী তো জাতেরই অংগ। যে আক্বিদার কারণে খ্রিস্টান সন্তানবাদীরা কাফের সে আকিদার কারণেই 'জাতি নূরের তৈরী' আকিদা পোষণকারীরা কাফের। যার দলিল উপরে উল্লেখিত হয়েছে। সূরা ইখলাসে উল্লেখিত 'আল্লাহু আহাদ' বাক্যটি দ্বারা উপরিউক্ত সমস্ত আকিদা আল্লাহ বাতিল করে দিয়েছেন। আহাদ মানে এক ও একক। আরবিতে বলা হয়-

الفرد البائن من خلقه والواحد الغنى عن خلقه

অর্থাৎ- "এমন সত্তা যা সৃষ্টিজগতের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন একক সত্তা যিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে অভাবমুক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি থেকে আলাদা, অবিভাজ্য অবিমিশ্রিত। যেখানে দ্বৈততার কোনই অবকাশ নেই।

আল্লাহ তো তাঁর সত্তার মধ্যে বিলীন হওয়ার (ফানাফিল্লাহ) জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেননি। তিনি সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর ইবাদাতের মধ্যে বিলীন হওয়ার জন্য। তাঁকে ভালবেসে, তাঁকে ভয় করে, হৃদয় ভরা আশা নিয়ে তাঁর আদেশ নিষেধ পালন করার জন্য। অতএব জীবনটা এ পথেই বিলীন করা উচিত।

১২. জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করা-

(ক) কুফর (খ) শিরক (গ) বিদায়াত

উত্তর ঃ কুফর।

দলিল ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ – (سورة يس–٣١)

অর্থাৎ- "তারা কি দেখে না তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যে, তারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না।"

(সূরা ইয়াসিন- ৩১)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল মৃত্যুর পর পৃথিবীতে ফিরে আসা, পুনর্জন্ম লাভ করা, জন্মান্তর বা অন্য কায়ায় জন্মলাভ করা এ সবই শয়তানী ও কুফরী বিশ্বাস। নিরামিষভোজীদের এ বিশ্বাস একেবারে মিথ্যা। তারা তো গোশত ছেড়ে দিয়েছে এ ভয়ে যে, ঐ পশুটা হয়তবা তার পিতা, মাতা, প্রপিতা বা অন্য যে কোনো আপন বা পর মহাপুরুষ। যে পুনর্জন্মে কায়া পাল্টে হয়তোবা গরু বা ছাগল ইত্যাদি হয়ে জন্ম লাভ করেছে। এগুলো জবেহ করা মানে নিজের পুনর্জন্মপ্রাপ্ত পিতা-মাতা প্রমুখকে জবেহ করা। তাই নিরামিষ না খেয়ে কোন উপায় আছে। বেচারা পুনর্জন্মবাদীরা এ ভাবেই আখেরাত তো হারালই দুনিয়াটাও হারিয়েছে।

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

এ কবিতায় জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ক্ষুদিরাম ব্রিটিশদের ফাঁসির কাষ্ঠে যাবার আগে তার মাকে পুনর্জন্মের কথাটিই বলে গেলেন। যা স্পষ্ট কুফর। অথচ অজ্ঞ মুসলমানরা এ গানটি গাওয়া ইবাদতের মতই মনে করে। এ গান

গেয়ে এ বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। আল্লাহ মুসলিম জাতিকে ভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিন।

১৩. হযরত আবু বকর, উমর, উসমান (রাঃ) এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরা হল-

(ক) শিয়া (খ) কাদিয়ানী (গ) ব্রেলভী

উত্তর ঃ শিয়া।

শিয়া হল ইহুদী আব্দুল্লাহ ইবনু সাবার আকিদার অনুসারী একটি বিদয়াতগ্রস্ত ভ্রান্ত দল। আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহ বলে উক্তি করত। তাদের কারো আকিদা হল আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন আল্লাহ আর তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমরা তাদের এসব শিরক থেকে আল্লাহর উর্ধ মর্যাদা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। এরাই আবু বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালিগালাজ করে। তাদের কেউবা আবু বকর, উমরকে কাফের-মুরতাদ বলে। কেননা তাদের কথায় এ দু'জনের কারণে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে খলিফা হতে পারেননি। ইহুদী ইবনু সাবা এভাবেই মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য নবীর বংশধর বলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উর্ধ্বে তুলে আল্লাহর মর্যাদায় আসীন করল। এদের একদলকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতকালে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। ইবনু সাবা অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিল। অতঃপর সে রোমে চলে যায়। আমরা আলী, হাসান, হোসাইন, ফাতেমা রদিয়াল্লাহু আনহা ও আনহুম সহ নবীজীর সকল বংশধরকে ভালবাসি। তাঁরা আমাদের প্রাণের টুকরো এতে কোন সন্দেহ নেই। তাদেরকে যারা ভালবাসবে একই কারণে তারা আবু বকর, উমর, উসমান সহ সকল সাহাবীকে সমানভাবে ভালবাসবে তাঁদের কারো জন্যেই বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না। অতি ভালবাসা কোন ভালবাসাই নয়। এটা বরং ভালবাসার পাত্রকে নিন্দিত করার নামান্তর। বাংলাদেশে এক সময়ে কারবালা দিবসের হায় হোসাইন, হায় হোসাইন চিৎকার, তাজিয়া, হোসাইন, আওলাদ হোসাইন নামের আধিক্য, ইয়া আলী হুংকার, সুফীবাদ, পীরবাদের ছড়াছড়ি, গাউস-কুতুব, খাজা বাবা, দয়াল বাবার আতিশয্য, কবর-মাজার পূজা, নবী, ওলী-আউলিয়াদের প্রতি আল্লাহর মত করে ভক্তি-শ্রদ্ধা এসব বিভ্রান্তি অনেকটাই এসেছে ফারসি ভাষা ও শিয়া সংস্কৃতির মাধ্যমে। এর অধিকাংশই শিয়াদের মিরাস। যা আমরা ফারায়েজ করেই ভাগ করে নিয়েছি।

১৪. বিশ্বের কোন ইলাহ বা সৃষ্টিকর্তা নেই, জীবনটাই হলো বস্তুনির্ভর, এ উক্তি-

(ক) কাদিয়ানিদের (খ) শিয়াদের (গ) কমিউনিস্টদের

উত্তর ঃ কমিউনিস্টদের।

কমিউনিস্ট নাস্তিকরা ফেরআউনের উত্তরসূরি কাফের। তাদের জনক ফেরআউন মূসা আলাইহিস সালামকে সদম্ভে যে প্রশ্নটি করেছিল কুরআনে তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ – (سورة الشعراء–٢٣)

অর্থাৎ- "ফেরআউন বলল- রাব্বুল আলামীন আবার কী ?" (সূরা শুয়ারা-২৩)

কিন্তু নিদানকালে নাকানি চুবানি খেয়ে এ ফেরআউন কীভাবে পাকা আস্তিক হয়ে গিয়েছিল কুরআন তা এভাবে উদ্ধৃত করেছে। আল্লাহ বলেন-

حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلـــهَ إِلاَّ الَّذِى آمَنَتْ بِه بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ –

(سورة يوسف– ٩٠–٩١)

অর্থাৎ- "এমনকি যখন তাকে নিমজ্জন আক্রান্ত করল তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, যার উপর ঈমান এনেছে বনি ইসরাইল। বস্তুত আমিও মুসলমানদেরই একজন। এখন এ কথা বলছ ! অথচ তুমি ইত:পূর্বে নাফরমানি করেছিলে ! এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে!

(সূরা ইউনুস ৯০ ও ৯১)

বিংশ শতাব্দিতে কাস্পিয়ান সাগরে একই ঘটনা ঘটেছিল, যখন রুশ কমিউনিস্টদের দুর্দণ্ড প্রতাপ প্রেসিডেন্ট লিউনিদ ব্রেজনেভ হ্যারিকেন ঝড়ে কবলিত হয়ে 'মাই গড' বলে সচিৎকারে আল্লাহর প্রতি ঈমান ঘোষণা করেছিল। প্রথম ফেরআউনের ঈমানটি ছিল একেবারে মুমূর্ষু অবস্থায় অন্তিম মুহূর্তে। এজন্য তা কবুল হয়নি। আর বিংশ শতাব্দীর ফেরআউনের ঈমানটি ছিল মোটামুটি জ্ঞান ও সম্বিত থাকা অবস্থায়। এমতাবস্থায় বিপদগ্রস্ত নাস্তিককেও আল্লাহ দয়া করেন। তাই হয়ত দ্বিতীয় নাস্তিক ফেরআউন আল্লাহর পাকড়াও হতে নাকানি চুবানি খেয়ে সলিল সমাধি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

১৫. মানুষ বানরের বিবর্তিত রূপ- এ সংজ্ঞা দিয়েছে-

(ক) কার্ল মার্কস (খ) চার্লস ডারউইন (গ) সিগমন্ড ফ্রয়েড

উত্তর ঃ চার্লস ডারউইন।

ডারউইনের মতবাদটি একটি কুফরী মতবাদ। মানব জাতির বিরুদ্ধে এ ধরনের জঘন্য অপরাধ সম্ভবত আর কেউ করেনি। মহাবিশ্বের আদি-অন্তের যে সব সত্য অনস্বীকার্য ইতিহাস আল কুরআন তুলে ধরেছে তার মধ্যে অন্যতম হল মানব জাতির সৃষ্টির ইতিহাস। সৃষ্টির সেরা মাখলুক মানব জাতির সৃষ্টি ও সূচনার ইতিহাস বর্ণনায় আল কুরআন কোন কার্পণ্য করেনি। এদের উৎস বর্ণনায় দায়িত্ব ভার ডারউইনের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন মিথ্যাজীবীদের হাতে অর্পণ করেনি। আর কুরআনের ভুরি ভুরি আয়াতে মানব জাতিকে বনী আদম তথা আদমের বংশধর বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ বলেন-

يَابَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ – (سورة الاعراف–٢٧)

অর্থাৎ- "হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে। যেমন করে সে তোমাদের মাতা-পিতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল।"

(সূরা আ'রাফ- ২৭)

বস্তুত ডারউইনের উক্ত মতবাদ একটি শয়তানী মতবাদ। শয়তান তাকে দিয়ে এ মতবাদটি প্রচার করিয়েছে মাত্র। একবিংশ শতাব্দীকে যদি প্রাণী বিজ্ঞানের উৎকর্ষের শতাব্দী ধরে নেয়া হয় তাহলে বুঝতে হবে বাস্তব বিজ্ঞান ডারউইনের মতবাদের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে। মানব জ্যানোমের যে মানচিত্র তৈরী হয়েছে সে মানচিত্রে ধরা পড়বে প্রতিটি জিনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা তিনশ' কোটি বেসপেয়ার বা আদি জোড়ায় স্রষ্টা রাব্বুল আলামীন মানবের বংশগতিসহ তার সৃষ্টির ইতিহাসটিও লিখে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ – (سورة الذاريات–٢١)

অর্থাৎ- "তোমাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে (কত নিদর্শন), তা কি দেখ না?"

(সূরা যারিয়াত- ২১)

অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের ব্লু প্রিন্ট দেখে নাও। সেখানে স্রষ্টার তথ্য দেয়া আছে। আরো দেয়া আছে তোমার পিতৃপরিচয়ের সত্য তথ্য। এই ব্লু প্রিন্টের এডেনিন, থিয়ামিন, সাইটোসিন, গুয়ানিন নামক চারটি উপাদানের কোন একটি কণিকায় বানরের বংশগতির বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে কি ? আল

কুরআনের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছি তোমাদের প্রতি। এর ভেতর থেকে বানরের বৈশিষ্ট্য বের করে আনো যদি সত্যবাদী হও। যদি না পারো, আর পারবে নাতো কখনোই তাহলে ভয় কর জাহান্নামের, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যা তৈরী রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- (মানবশিশু সৃষ্টি করার সময়) أحضر الله كل نسب دون أدم অর্থাৎ- "আল্লাহ তার মাতা-পিতার উপাদানে আদম থেকে শুরু করে এই শিশুর মাতা-পিতা পর্যন্ত যত বংশ বৈশিষ্ট আছে সব হাজির করান।" (জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম)

রাসূল তো মানব জ্যানোমে আদমের বংশ বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে গেলেন। তোমরা বানরের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে দাও, যদি পার।

আল কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ সূরায় বিস্ময়করভাবে মানব সৃষ্টির উপাদান হিসেবে শুধু একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'আলাক্ব' যার মধ্যে আইন লাম ক্বাফ এ তিনটি বর্ণ রয়েছে। এই তিন বর্ণের সিকোয়েন্স বা বিন্যাসের ধারাবাহিকতার মধ্যে লেগে থাকা, সংযুক্ত থাকা ও ঝুলন্ত থাকার অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। আবার ভালবাসার পাত্রকে 'যু ইলক্ব' বলা হয়। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে অপর ব্যক্তির সাথে প্রীতির ডোরে আবদ্ধ থাকে। মানবকোষে প্রায় ছয়ফুট দীর্ঘ যে ঝুলন্ত ডি এন এ চেইন বা মই রয়েছে তা কি এ আলাক্ব শব্দটির অর্থের আওতায় এসে যায় না ? আলাক শব্দের পূর্বের আয়াতে ইক্বরা, পরের আয়াতেও বিস্ময়করভাবে রয়েছে ইক্বরা বা পড়। দু' ইক্বরা মাঝখানে রাখা হয়েছে আলাক্ব শব্দটিকে। এ বাক্য বিন্যাস এবং পড়া নির্দেশের আওতায় জেনেটিক কোড আবিষ্কারের ভবিষ্যদ্বানী টি কি এসে যায় না ? এর পরবর্তী আয়াত তথা 'আল্লাহ মানুষকে শেখান ঐ জ্ঞান যা সে অতীতে জানত না' এ আয়াতটি কি বলে দেয় না যে, জেনেটিক কোডের আবিষ্কার ঐ জ্ঞানের ধারাবাহিকতায়ই এসেছে, যার সূচনা করেছিল কুরআন ও ইক্বরা। কুরআন জ্ঞানের এ দরজা না খুললে কখনোই আবিষ্কৃত হতো না মানব জ্যানোম। জ্ঞান বলতে তো সকল উপকারী জ্ঞানকেই বুঝায় এবং সেই উপকারী জ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দিয়েও বাতিল করে দেয়া যায় ডারউইনের মিথ্যা মতবাদ। মানব জাতিকে এ জ্ঞানপাপী শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করা অবশ্যই মুসলিম বিজ্ঞানীদের কর্তব্য।

১৬. শাফায়াতে কুবরার মালিক-
(ক) হযরত ইবরাহীম (আঃ) (খ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) (গ) হযরত মুসা (আঃ)

উত্তর ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

দলিল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أتانى أت من عند ربى فخيرنى بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهى لمن مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا (ترمذى، ابن ماجة)

অর্থাৎ- "আমার নিকট আমার রবের পক্ষ থেকে এক আগন্তুক এসেছে। সে আমাকে শাফায়াত গ্রহণ এবং আমার উম্মতের অর্ধেক জান্নাতে প্রবেশ করা- এ দু'য়ের কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিল। আমি শাফায়াত গ্রহণ করলাম। এটি (শাফায়াত) আমরা উম্মতের মধ্যে যারা শিরক না করে মৃত্যুবরণ করবে তাদের জন্য।"

(তিরমিযি, ইবনু মাজাহ)

১৭. কাফের, পৌত্তলিক, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের নববর্ষ, ভ্যালেন্টাইন ডে, থার্টি ফাস্ট নাইট, বৈশাখী মেলা, রেগ ডে ইত্যাদি উদযাপন করা ঃ
(ক) জায়েজ (খ) হারাম (গ) কুফর

উত্তর ঃ হারাম।

দলিল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من تشبه بقوم فهو منهم (أبو داؤد)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখবে সে তাদেরই একজন।" (আবু দাউদ)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

عن عبد الله بن عمرو قال من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم و مهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذالك حشر معهم يوم القيامة

(بيهقى، مجموعة التوحيد)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি অনারবীয় দেশে বসবাস করে সে যদি সে দেশের নববর্ষ, মেহেরজান উদযাপন করে এবং বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখে

এমনকি এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে তবে কিয়ামতের দিনে তাকে তাদের (কাফের) সাথে হাশর করা হবে।

(বায় হাক্বী, সনদ বিশুদ্ধ। মাজমুয়াতুত্ তাওহীদ- ২৭৩)

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে-

اهتم النبى صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس لها (الصلاة) فذكروا له طنبور اليهود فلم يعجبه ذالك وقال هو من أمر اليهود قال فذكروا له الناقوس فقال هو من أمر النصارى (أبو داؤد، نسائى نحوه)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে সালাতের জন্য কীভাবে একত্রিত করবেন এ নিয়ে চিন্তা যুক্ত হলেন। সাহাবাদের একদল ইহুদীদের সিংগা বাজাবার প্রস্তাব করল। এটা ইহুদী সংস্কৃতি হওয়ার ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাখ্যান করলেন। আরেকদল খৃস্টানদের কাষ্ঠ ঘন্টি বাজাবার প্রস্তাব করল। এটাও খ্রিস্টান সংস্কৃতি হওয়ার ফলে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন।

(আবু দাউদ, নাসাঈসহ অনেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

প্রশ্নে বর্ণিত উৎসবসমূহ কাফের ও আল্লাদ্রোহীদের ধর্মীয় উৎসব। এগুলোর সাথে বাহ্যিক সাদৃশ্য আন্তরিক সাদৃশ্যে পরিণত হতে পারে এবং একজন মুসলমানকে কুফরের দিকে টেনে নিতে পারে। বাহ্যিক সম্পর্ক ও মিলের কারণে অন্তরের সম্পর্ক ও মিল সৃষ্টি হয়। অতএব কাফেরদের সাথে বাহ্যিক সাদৃশ্য সৃষ্টি হয় এমন যে কোনো কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকা ফরজ।

১৮. ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা আছে, সর্বোত্তম হলো-

(ক) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (খ) লজ্জা (গ) রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্তু অপসারণ

উত্তর ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

দলিল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله (بخارى، مسلم)

অর্থাৎ- "ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম হল- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা।" (বুখারী, মুসলিম)

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সম্পর্ক জ্ঞানের সাথে। আল্লাহ বলেন-

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلٰــهَ إِلَّا اللهُ – (سورة محمد–١٩)

অর্থাৎ- "তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"
(সূরা মুহাম্মাদ- ১৯)

পক্ষান্তরে শিরকের সম্পর্ক অজ্ঞতা ও মূর্খতার সাথে। আল্লাহ বলেন-

قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُوْنِّى أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ – (سورة الزمر–٦٤)

অর্থাৎ- "বলুন- হে মূর্খরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছ?" (সূরা যুমার- ৬৪)

অতএব, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যারা পড়েছেন তাদেরকে এ কালেমার না-বাচক অংশ তথা 'লা ইলাহা' এবং হাঁ বাচক অংশ তথা 'ইল্লাল্লাহ' সম্পর্কে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান শিখতে হবে। এ কালেমাটি শুধু মুখে বললে মোটেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না। কেননা শিরকের মূল কারণ হল মূর্খতা। আর কালেমা সম্পর্কে মূর্খতাই হল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মূর্খতা। কালেমার প্রথম অংশে 'কোন ইলাহ নেই' বলে কাদেরকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং 'আল্লাহ ব্যতীত' বলে আল্লাহর কোন ধরনের স্বীকৃতির কথা বলা হয়েছে এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ, দালিলিক ও প্রামাণ্য এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন না করলে সাফল্যের আশা করা যায় না।

কালেমার প্রথম অংশে কি মূর্তি, প্রতিকৃতি, স্মৃতিস্তম্ভ, অগ্নিশিখা, কবর-মাজার তাগুত ইত্যাদির পূজাকে অস্বীকার করা হয়নি? আর দ্বিতীয়াংশে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর ইবাদত, দাসত্ব, আনুগত্য করার জন্য তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ, আইন-বিধান মেনে নেয়ার কথা বলা হয়নি? চুরি-ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, সুদ ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহর কি কোন আইন বিধান নেই? সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে আমরা নিজেরাই যখন অন্য আইন তৈরী করলাম তখন কি আমরা কালেমার দ্বিতীয়াংশকে জীবন থেকে বাতিল করে দেইনি? আল্লাহর আইন-বিধান বর্জন তো দূরের কথা সেগুলো পুনর্বিবেচনা করার কোন সুযোগও কি আছে কোন মুসলমানের জীবনে? আল্লাহ তায়ালা তো কোথাও তাঁর বিধান পালনের ক্ষেত্রে কাউকে চিন্তা-ভাবনা কিংবা পুনর্বিবেচনা করার কোন সুযোগ দেননি। আল্লাহ বলেন-

وَ اللهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ – (سورة الرعد–٤١)

অর্থাৎ- "আল্লাহ হুকুম দেন, তাঁর হুকুমের কোন পুনর্বিবেচনাকারী নেই। তিনি তো শীঘ্রই হিসাব গ্রহণকারী।" (সূরা রা'দ- ৪১)

যেখানে আল্লাহ তাঁর কোন একটি বিধানে কাউকে পুনর্বিবেচনার সুযোগও দেননি বরং সরাসরি প্রয়োগ করতে বলেছেন সেখানে সংসদে বসে যারা আল্লাহর আইন গ্রহণ তো দূরের কথা পুনর্বিবেচনা করতেও রাজি হন না তাদের জেনে রাখা উচিত উক্ত আয়াতে "সারীউল হিসাব" কথাটি আল্লাহ কেন বললেন এবং কাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ? অতএব আল্লাহর হিসেব নিকেশ শুরু হওয়ার আগে নিঃশ্বাসটা বাকি থাকতে বাঁচার উপায়টি খুঁজে নিন। হিসেব নিকেশ অত্যাসন্ন, এতে কোনই সন্দেহ নেই।

১৯. তুমি আল্লাহর এমনভাবে ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ, যদি না পার তবে তিনি (আল্লাহ) তোমাকে দেখছেন এ সংজ্ঞা হল-

(ক) ইসলামের (খ) ইহ্সানের (গ) ঈমানের

উত্তর ঃ ইহ্সানের।

দলিল ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (بخارى، مسلم)

অর্থাৎ- "ইহসান এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছে, যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ তিনি তো তোমাকে দেখছেন।" (বুখারী, মুসলিম)

২০. আল্লাহ পাক বান্দাহর যে সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় কাজ ও কথায় সন্তুষ্ট থাকেন তাকে বলে-

(ক) ইসলাম (খ) ইবাদত (গ) তাওহীদ

উত্তর ঃ ইবাদত।

বস্তুত আল্লাহর পছন্দনীয় সকল বিশ্বাস, ভরসা, ভয়, আশা, ভালবাসা, জিহ্বার সকল কথা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সকল কর্মতৎপরতা এক কথায় আল্লাহর সন্তোষভাজন সব কিছুই ইবাদাত হিসাবে সাব্যস্ত। আল্লাহ বলেন-

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَاماً ۞ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَّقِيَاماً ۞ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ۞ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرّاً وَّمُقَاماً ۞ وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَاماً

✪ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلٰـهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَاماً ✪ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَاناً ✪ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلٰـئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَّكَانَ اللهُ غَفُوْراً رَّحِيْماً ✪ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللهِ مَتَاباً ✪ وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَاماً ✪ وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمّاً وَّعُمْيَاناً ✪ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَاماً ✪ أُولٰـئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلاَماً ✪ خَالِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَّمُقَاماً

(سورة الفرقان٦٣-٧٦)

"রাহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে তখন তারা বলে, সালাম। এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে। এবং যারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; বসবাস ও আবাস হিসাবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা এবং তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, ন্যায্য কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে উত্তমভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয় তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়। এবং যাদের কে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বুঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধিরসদৃশ আচরণ করে না। এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে ও আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের

জন্য আদর্শস্বরূপ কর। তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দুআ ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম।"

(সুরা আল ফুরকান- ৬৩ - ৭৬)

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على نبينا محمد و على اله و صحبه و بارك و سلم

কাজী মুহাম্মাদ ইবরাহীম
তাওহীদ
জিজ্ঞাসা
জবাব ১